রামলীলামৃত

ওঁ

শ্রীসতীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, এম, এ, বিদ্যাভূষণ

রামলীলামৃত

(সম্পূর্ণ অভিনব আধ্যাত্মিক আলোচনা)

শ্রীসতীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, এম, এ, বিদ্যাভূষণ
চকদীঘি সারদা প্রসাদ উচ্চবিদ্যালয়ের প্রাক্তন
প্রধান শিক্ষক এবং শ্রীশ্রীগীতামৃত প্রণেতা

দক্ষিণা—দুই টাকা মাত্র

সূচীপত্র

শ্রীসতীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

আবির্ভাব—
২০শে বৈশাখ, শনিবার, ১২৮৭ সাল।
(কৃষ্ণা অষ্টমী)

তিরোভাব—
২৬শে মাঘ, শনিবার ১৩৫৮ সাল।
(শুক্লা চতুর্দ্দশী)

প্রকাশকের বক্তব্য
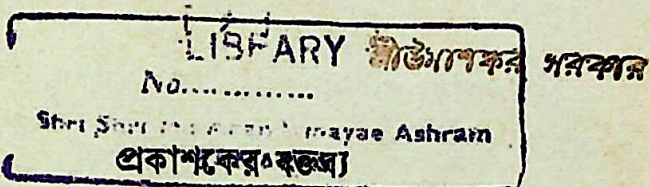
ধর্মপ্রাণ সাধক শ্রীসতীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার জীবদ্দশাতেই তাঁহার সংগঠিত শ্রীকৃষ্ণ সেবা সমিতির অন্যতম স্থায়ী সদস্য এবং একমাত্র স্থায়ী শাস্ত্র সম্পাদকরূপে আমাকে মনোনীত করিয়া গিয়াছেন। তিনি শেষ জীবনে যখন শ্রীশ্রীগীতামৃত পুস্তকটি রচনা ও মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন তখন তিনি আমাকে উক্ত কার্যের বিভিন্ন বিষয়ে ভার প্রদান করিয়া পুস্তক প্রকাশ ব্যাপারে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যজীবনে অপরের অনুরোধে এবং তাঁহাদের সাহায্যের জন্য গীতা ব্যাখ্যার যে পরিবর্তন পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করিয়াছিলেন তাহাতেও আমার সক্রিয় সহযোগিতা ছিল।

মনে হয়, তাঁহার ইচ্ছা ছিল তাঁহার আজীবন সাধনলব্ধ আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞান ও তাহার যুগোপযোগী প্রয়োগ এক কথায় তাঁহার আধ্যাত্মিক ভাবধারা আমার মাধ্যমে ভবিষ্যতে প্রকাশ ও প্রচার সম্ভব। সেইজন্য এই গুরুদায়িত্ব সমর্পন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহা কার্যতঃ কতটা সম্ভব হইয়াছে সে সিদ্ধান্ত সাধারণের বিচার্য।

তাঁহার দেহ রক্ষার পর হইতেই তাঁহার রচিত আধ্যাত্মিক উচ্চতত্ত্ব সমন্বিত এই 'রামলীলামৃত' প্রকাশের ইচ্ছা বলবতী ছিল। এত দিনে শ্রীকৃষ্ণ সেবা সমিতির উদ্যোগে তাহা কার্যে পরিণত হওয়ায় অত্যন্ত আনন্দলাভ করিতেছি।

এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপিখানি বেশ কয়েকবার হস্তান্তরের ফলে নষ্টপ্রায় হইয়া গিয়াছিল। শ্রীভগবানের অসীম কৃপায় অবশেষে ইহা আমার হস্তগত ও সযত্নে রক্ষিত হয়। এবং তজ্জন্যই প্রকাশের সুযোগ পাইল।

তাঁহার ইচ্ছা ছিল গীতা প্রকাশের পর ইহার কিঞ্চিৎ পরিবর্ধন করিবেন, কারণ ইহা তাঁহার গীতার ব্যাখারও পূর্বে অর্থাৎ প্রথম রচনা এবং বেদান্ত প্রতিপাদ্য গূঢ়তত্ত্ব অতি সংক্ষেপে এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা আবশ্যক। কিন্তু তাঁহার স্বীয় জীবন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী, "গীতা প্রকাশের ও প্রচারের পরই আমার কার্য শেষ তথা জীবন শেষ হইবে।"—ইহা সফল হওয়ায় অর্থাৎ গীতা প্রকাশের কিঞ্চিৎ পরেই তিনি দেহ-রক্ষা করায় আলোচ্য পুস্তক সম্বন্ধে নূতন করিয়া চিন্তার আলোকপাত করা তাঁহার পক্ষে আর সম্ভবপর হয় নাই। তবে মনে হয় তাঁহার রচিত গীতামৃত পুস্তকে ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যান হইয়াছে। আমরা তাঁহার রচিত রামলীলামৃত পুস্তকের পাণ্ডুলিপিটি যথাযথ প্রকাশ করিলাম মাত্র।

এই পুস্তকটি উপনিষদ ও গীতার ভাব সমন্বয়ে রচিত। অধ্যাত্ম সাধনার উচ্চতত্ত্ব ও তথ্য সমাবেশে ইহার বিষয়বস্তু কিঞ্চিৎ কঠিন হইয়াছে। সুধী বিজ্ঞ সাধকগণ ইহার তত্ত্ব আলোচনায় আনন্দ ও স্বীয় স্বীয় সাধনায় কথঞ্চিৎ সাহায্য লাভ করিলেই আমাদের প্রয়াস সার্থক হইবে।

ইহার অমূল্য মুখবন্ধটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনবিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ও আমেরিকার হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব

অধ্যাপক মান্যবর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম. এ., পি. এইচ. ডি, মহাশয় রচনা করিয়া দিয়া আমাদের অশেষ উপকার করিয়াছেন। তাঁহার সহিত আমাদের যোগাযোগ ও আলাপের মূলপাত্র আমার স্নেহাস্পদ শ্রীমৎ স্বামী নির্মলানন্দ গিরি। ইহার জন্য নির্মলানন্দজীকে আমার স্নেহাশীর্বাদ অর্পণ করি।

এই পুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশ ব্যাপারে আমি শ্রীমান নীরদবরণ দাস প্রমুখ কয়েক জনের বিশেষ সহযোগিতা লাভ করিয়াছি। তাঁহারা সকলে আমার বিশেষ স্নেহাস্পদ। তাঁহাদের আশীর্বাদ করি তাঁহারা যেন আধ্যাত্মিক জীবনে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করেন।

পরম করুণাময় শ্রীভগবানের ইচ্ছায় এই পুস্তক প্রকাশিত হওয়ায় পুনরায় আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। অলমতি বিস্তারেণ। ইতি—

গীতাশ্রম (শ্রীমানপুর)
পোঃ—পাড়াতল (বর্ধমান)
৺দোলপূর্ণিমা, ১৩৬৮ বংগাব্দ

স্বামী বিশ্বানন্দ গিরি,
শাস্ত্র সম্পাদক,
শ্রীকৃষ্ণ সেবা সমিতি।

"অর্ঘ্য"

'মাষ্টারমশাই' কথাটি বলতে যে ভাবটি মনে জেগে উঠে তা হ'ল ভারতের সে কালের গুরুমশাই বা সে যুগের আচার্য। এ কালের টিচার, টিউটর, শিক্ষক, অমুকবাবুর যুগের শিক্ষকতার কথা মনে আসে না। ভারতে সব বিষয়ের সেকাল একালের মত শিক্ষাদান ব্যাপারেও যুগের প্রভাবে পরিবর্তন এসেছে।

এ দেশের কবিগুরুর কথাতে বলা যায়—"গুরুশিষ্যের পরিপূর্ণ আত্মীয়তার মধ্য দিয়াই শিক্ষাকার্য সজীব দেহে শোণিত স্রোতের ন্যায় চলাচল করিতে পারে।" আর ও দেশের ভাষায় শিক্ষক হবেন—Friend, philosopher and guide. কিন্তু এ যুগে উত্তম শিক্ষাগুরু বলতে বোঝায় যিনি পুঁথিগত তাত্ত্বিক (theoretical) এবং গবেষণাগার বা যন্ত্রাগারের ব্যবহারিক (practical) জ্ঞান দানে বেশ দক্ষ তিনিই উত্তম শিক্ষক। এ শুধু মস্তিষ্কের শিক্ষা, যান্ত্রিক শিক্ষা। হৃদয়ের সঙ্গে অন্তরের সঙ্গে কোন যোগ না থাকলেও ক্ষতি নেই। যেন কোন আন্তরিকতা নেই—গুরু শিষ্যের আত্মীয়তার কোন বালাই নেই। শুধু শিক্ষক ছাত্রের যান্ত্রিক সম্বন্ধ। আর সে যুগে শিক্ষাদানরতরা শিক্ষাগ্রহণরতদের জীবন ধারা পর্যন্ত প্রভাবিত করতেন, আলোকিত করতেন এবং শিষ্য গুরুর আদেশ পালনের, প্রীতি সাধনের কর্তব্যের মধ্য দিয়ে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁর আদর্শ অনুকরণ ও অনুসরণ করে বর্তমান ও ভবিষ্যতে জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করে নিতেন। এক

কথায় আচার্য্যের সৎআচরণ শিষ্যের জীবনে যখন প্রতিফলিত হত তখন হত উত্তম শিক্ষা। শিক্ষায় সে যুগও এ যুগের পার্থক্যের এই মূল কথা।

শিক্ষার এই যুগসন্ধিক্ষণে বর্ধমান জেলার চকদীঘি অঞ্চলের অসীম সৌভাগ্যবশতঃ সে যুগের এক মহান্ শিক্ষাগুরুকে এ যুগের সীমায় আমরা পেয়েছিলাম। চকদীঘি সারদা প্রসাদ উচ্চইংরাজী অবৈতনিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পূজ্যপাদ ঠাকুর শ্রীসতীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের কথা বলছি। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদান্তদর্শনের এম. এ., পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে ১৯০৮ খৃঃ অব্দে এই বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসাবে কর্মজীবন সুরু করেন এবং ১৯৪৯ খৃঃ অব্দে শেষ করেন। তার পরে অবশ্য আরও কিছু দিন তাঁর প্রেরণায় স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ দাস প্রমুখ কয়েক জনের অর্থানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত সিপ্তাই জুনিয়র হাই স্কুলে অবৈতনিক ভাবে স্বেচ্ছায় শিক্ষকতা করেন। সাধারণে এই বিদ্যালয়ের নামকরণ করেন সিপ্তাই মহুলা সতীরঞ্জন ইনস্টিটিউসন। মোটের উপর প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রেরণায় চকদীঘির সুপ্রসিদ্ধ জমিদার দানবীর মহাপ্রাণ সারদা প্রসাদ সিংহরায়ের প্রতিষ্ঠিত অবৈতনিক সারদাপ্রসাদ ইনস্টিটিউসনে চল্লিশ বৎসরের উপর শিক্ষাদান কার্যে ব্রতী থাকাটাই ছিল তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র। এ কাজে তিনি সে যুগ ও এ যুগের এক অপূর্ব সমন্বয় সাধন করে গেছেন। তিনি সে যুগের শিক্ষাচার্যের মত ছাত্রের পরজীবন ও পরকালের পাথেয় সংগ্রহ এবং এ' যুগের শিক্ষাগুরুর মত ছাত্রের বর্তমান জীবন ও ইহকালের পাথেয়, অভিজ্ঞ সংসারীর উপযোগী মস্তিষ্কের

শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দিব্য আধ্যাত্মিক জীবনের উপযোগী হৃদয়ের শিক্ষার অত্যাশ্চর্য যোগাযোগ করে গেছেন। বেদান্তদর্শন বলে—বেদ থেকে সুরু করে যা কিছু লৌকিক জ্ঞান সবই অপরাবিদ্যা আর পরাবিদ্যা হচ্ছে—তয়া যদক্ষরম্ অধিগম্যতে—অধ্যাত্মিক উন্নতির শিক্ষাই আদর্শ শিক্ষা। প্রাচীন ভারতের শিক্ষার আদর্শ ছিল আধ্যাত্মিক উন্নতি। আধ্যাত্মিক উন্নতি বলতে শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থপর প্রচেষ্টা বোঝায় না—বোঝায় সর্বভূতহিতেরতারূপ কর্মের প্রচেষ্টা। ভারতে ইষ্টের প্রণাম করা হয় জগৎহিতায় রূপে। তাই ঠাকুর শ্রীসতীরঞ্জন বলতেন, নিজের জীবন ও চরিত্রের উন্নতির দিকে লক্ষ্য না রেখে অপরকে উন্নত করার হাস্যকর বৃহৎ প্রচেষ্টা অপেক্ষা নিজের সততা উন্নতির ক্ষুদ্র চেষ্টা অনেক ভাল। হাতের কাছের টেবিলে পাতা চাদর বা মেঝের পাতা কম্বলের একটি অংশ টেনে ধরে তুলে তিনি বুঝিয়ে দিতেন যে, সমাজের অংশ হিসাবে কোন এক বিশেষ ব্যক্তি সত্যকার উন্নত হলে বাধ্য হয়ে পাশাপাশি কিছু অংশকে কিছু লোককে কতকটা উন্নত হতেই হবে। আর প্রত্যক্ষ উদাহরণ ছিলেন তিনি নিজে। 'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শেখাবে'—নীতি আন্তরিকভাবে আজীবন অনুসরণ করে ছাত্রদের উন্নত করে তিনি হয়েছেন আমাদের আদর্শ আচার্য।

বহুকাল পরাধীনতার অভিশাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ভারত তার নিজস্ব প্রাচীন শিক্ষার আদর্শ হারিয়ে পরের অন্ধ অনুকরণ করেছে। ভারতের ন্যায় ব্যক্তিগত সততা আধ্যাত্মিক উন্নতিতে অপরাপর দেশ জোর দেয় না। তাদের মতে ব্যষ্টি অপেক্ষা সমষ্টির কল্যাণের জন্য দলগত বা দেশের উন্নতির জন্য যা কিছু করা হয় তা উত্তম।

Greatest good for greatest number. হয়ত সে উন্নতির জন্য পরদেশ শোষণ লুণ্ঠন এমন কি মারণ অস্ত্রে পাইকারীভাবে নরমেধ যজ্ঞ চালিয়েও অপর দেশ দমন করার প্রয়োজন হ'তে পারে। তবে নিজের দেশের জন্য নিজের প্রাণও অনায়াসে বিসর্জন দেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হ'বে। দুর্ভাগ্যের বিষয় আমরা তাদের আদর্শের মন্দ দিকটা গ্রহণ করেছি, ভালটা গ্রহণ করিতে পারি নি। তুচ্ছ অল্প স্বার্থের জন্য ফাঁকি ও জাল ভেজালের বিষে নিজের দেশের নিজের ভাইয়ের বুকেও ছুরি বসাতে কুণ্ঠিত হচ্ছি না, আবার নিজস্ব ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক ও পরকালের চিন্তাকেও ও দেশের আদর্শের দোহাই দিয়ে এ যুগের এ দেশের ডাষ্টবিনে ফেলে দিচ্ছি। ফলে ইতো-ভ্রষ্ট-স্ততো-নষ্ট হয়ে ইহকাল, পরকাল, ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত, দেশের, জগতের, সকলের হিত, সব কিছু জাহান্নামে দিতে বসেছি।

এই চরম সঙ্কটের সময়, এই যুগ সন্ধিক্ষণে, কয়েকজন মহাপুরুষের আবির্ভাবে পথিভ্রষ্ট দেশের সাধারণ মানুষ সুপথের সন্ধান পায়, সৎপথে চলতে উদ্বুদ্ধ হয়। ভারত অধ্যাত্ম সাধনার তীর্থক্ষেত্র। এখানে গ্লানির প্রাবল্য হ'লে শ্রীভগবানের করুণায় যুগে যুগে মহামানবদের আবির্ভাব হয়ে থাকে। তাই এই সময় ধর্মের ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রাজনীতির ক্ষেত্রে গান্ধী, অরবিন্দ, কাব্যের ক্ষেত্রে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, সাধারণ সংসার ক্ষেত্রে ঠাকুর শ্রীসতীরঞ্জন প্রমুখ মহাপুরুষদের আবির্ভাব দেখতে পাই। অধ্যাত্মভারতের উপযোগী বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিভিন্ন অধিকারীদের সুপথের সন্ধান দেবার জন্যই এই সব মহাপুরুষদের আবির্ভাব। ঠাকুর শ্রীসতীরঞ্জনের ভাষায় আবার বলি, এই সব মহাপুরুষরা নিজের নিজের ক্ষেত্রে

নিজেদের আচার-আচরণ দ্বারা নিজেরা উন্নত হবার পথে সাধারণকে উন্নতির পথে আকর্ষণ করেছেন—এই হ'ল ভারতের আদর্শের রূপ।

ঠাকুর শ্রীসতীরঞ্জন বর্ধমান জেলার জামালপুর গ্রামের হরিভক্তি-পরায়ণ শ্রীশ্রীগোপালজীউর একনিষ্ঠ সেবক ৺হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুত্ররূপে ১২৮৭ বংগাব্দে ২০শে বৈশাখ, ইংরাজী ১৮৮০ খৃঃ অব্দে ১লা মে শনিবার বৈকাল সাড়ে চারটায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতার নাম ছিল এলোকেশী দেবী। হরিদাসবাবু ছিলেন সঙ্গতি-সম্পন্ন গৃহস্থ। গীতার ভাষায় বলা যায় 'শুচীনাং শ্রীমতাংগেহে' তাঁর জন্ম। তাঁর ছয় বৎসর বয়সে মাতৃবিয়োগ হয়। তিনি বিমাতারও বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন। তখন জামালপুরে বিদ্যাশিক্ষার কোন ভাল ব্যবস্থা না থাকায় তাঁর পিতার চেষ্টায় একটি মধ্যইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং তাতে তাঁর বিদ্যা-ভ্যাসের ব্যবস্থা করা হয়। এই বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হওয়ার পর উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠের সমস্যা আসে। জামালপুর হ'তে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে চকদীঘি উচ্চ বিদ্যালয়। তখনকার দিনে সাইকেল, মোটর বাস ইত্যাদির তত প্রচলন ছিল না। যানবাহনের মধ্যে গরুরগাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, পাল্কী প্রধান ছিল। এই সব যাতায়াতের অসুবিধার জন্য বর্ধমানে থাকার ব্যবস্থা এবং রাজস্কুলে ভর্তি করা হয়। রাজস্কুল হ'তে বর্ধমান এলবার্ট-ভিক্টর ইনস্টিটিউসনে যান এবং সেখান হ'তে ১৮৯৯ খৃঃ অব্দে তিনি প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা (Entrance) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে বর্ধমান রাজ কলেজ হতে এফ, এ, এবং কলিকাতা মেট্রোপলিটন কলেজ (বর্তমান নাম

বিদ্যাসাগর কলেজ) হতে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে বেদান্ত শাস্ত্রে এম. এ. অধ্যয়ন সুরু করেন।

সংস্কৃত কলেজে বেদান্ত-শাস্ত্র অধ্যয়নের পূর্ব পর্যন্ত তিনি আশৈশব ব্রাহ্মণের শাস্ত্রোচিত আচার পালনে অর্থাৎ নিয়মিত সন্ধ্যাহ্নিক পূজা ইত্যাদি ভক্তি পথের সাধনায় অভ্যস্ত ছিলেন। আচারবান সদব্রাহ্মণের বংশে জন্ম এবং তাঁর নিজস্ব সুকৃতি বলে তিনি এইরূপ নিষ্ঠাবান হয়েছিলেন। কিন্তু সংস্কৃত কলেজের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত প্রমথ নাথ তর্কভূষণের নিকটে বেদান্ত আলোচনায় তিনি নৈষ্কর্ম্য বা উত্তরমীমাংসা দর্শনের কর্মত্যাগকে মনে প্রাণে বরণ করে একনিষ্ঠ বৈদান্তিক হয়ে বেদান্তের তর্ক আলোচনায় মেতে উঠলেন। আরও উল্লেখ থাকে যে এম. এ. পড়ার সময় কবি কালিদাসের "মালবিকাগ্নিমিত্র" নাটকটি সংস্কৃত ভাষার অভিনয়ে তিনি সহপাঠীদের সঙ্গে অংশ গ্রহন করে ছিলেন এবং ল-কলেজে আইন শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং সর্টহ্যাণ্ড ও বুককিপিং শিক্ষাও এর মধ্যে আয়ত্ব করেছিলেন।

১৯০৮ খৃঃ অব্দে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং উক্ত বৎসরেই চকদীঘি সারদাপ্রসাদ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কর্মভার গ্রহণ করেন। তা' পূর্বেই বলা হয়েছে। বাল্যকাল হ'তে তাঁর ইচ্ছা ছিল সহরের কোন কলেজের অধ্যাপনা করা। কিন্তু শ্রীভগবান যে কাজের জন্য তাঁকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন সে কাজের সুবিধার জন্য গ্রাম্য বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকতার অনাড়ম্বর সরল কর্মক্ষেত্রেই তিনি যুক্ত হয়ে এ অঞ্চলে 'মাষ্টার মশাই' নামে চিরখ্যাতি লাভ করলেন।

সংসার জীবনে তিনি ছিলেন আদর্শ গৃহী। অর্থাভাব হয়ত তাঁর ছিল না—কিন্তু সাধারণের মত অভাব সৃষ্টি করে অর্থস্পৃহা বাড়ান নাই। প্রথম কর্মজীবনে বাড়িতে চতুষ্পাঠী খুলে ছাত্রদের সংস্কৃত অধ্যাপনা করেছিলেন। কিন্তু টোলের পণ্ডিতের মত তিনি কখনও কোন ক্রিয়াকাণ্ডে দান বা বৃত্তি গ্রহণ করেন নি। জীবনের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত নির্লোভ ছিলেন। কখনও কোনও প্রলোভনের বশে কোনও অন্যায়ের নিকট নতি স্বীকার করেন নি। এ' দিক দিয়ে সে যুগের ঋষিদের মত ছিল তাঁর জীবনযাপন প্রণালী। তাঁর বিদ্যালয়ের পরীক্ষার উত্তীর্ণের ব্যাপারে বা সামজিক বিচারে তিনি ছিলেন গ্রীক পুরাণের "ন্যায় দেবতার" মত অত্যন্ত কঠোর অপক্ষপাত অনমনীয় বিচারক। তাঁর কর্মক্ষেত্র চকদীঘি বিদ্যালয় অবৈতনিক থাকায় এবং সরকারী সাহায্য না লওয়ায় তাঁর সৎভাবে কাজ করার বেশ সুযোগ সুবিধা হয়েছিল। ইউনিয়ন বোর্ড গঠনের আগে পঞ্চায়েতের ব্যবস্থা ছিল। এই পঞ্চায়েতে শেষ পর্যন্ত তিনি জামালপুর পঞ্চায়েতের সভাপতি ছিলেন এবং সেই কাজে তাঁর অনেক পক্ষপাতশূন্য, নির্ভীক বিচার ও ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁর বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সারদাবাবুর পোষ্যপুত্র ধর্মপ্রাণ জমিদার ললিত মোহন সিংহরায়ের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সদ্ভাব ছিল এবং পরস্পরের মধ্যে ধর্মালোচনায় বহু সময় অতিবাহিত হ'ত। ললিতবাবু 'উচ্ছ্বাসমালা' নামে একটি ধর্মমূলক কবিতা পুস্তক রচনা করেন এবং ঠাকুর শ্রীসতীরঞ্জন তা'তে এক অপূর্ব ভাব সমন্বিত

ব্যাখ্যা সংযোজন করেন। ফলে সেটি ধার্মিকদের প্রিয় ও প্রয়োজনীয় পুস্তিকারূপে প্রকাশিত হয়।

প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সৌখিন প্রকৃতির ও বিলাসী। বিলাস ভোগের চরম তিনি করিয়াছিলেন। কিন্তু অশাস্ত্রীয় কোন ভোগেই তিনি কখনও আকৃষ্ট হন নাই। ভাল পোষাক, প্রসাধন, চা, তামাক, পান, সুখাদ্য ইত্যাদি ছিল তাঁর ভোগের উপকরণ। কিন্তু এর মধ্যেই সব সময়েই নিজ হাতে উত্তমভাবে গো সেবা করা নিত্যকর্ম ছিল। ত্যাগের জীবন আরম্ভে ধূমপান ছাড়া সব বিলাসিতাই একেবারে চরমভাবে বিসর্জন দিয়েছিলেন। সে কথা পরে বলা হ'বে।

বাল্যকাল হ'তে তিনি যে ভক্তিভাবে ধর্মকর্মের প্রতি অনুরক্ত ও অভ্যস্ত ছিলেন এবং এম. এ. পড়ার সময় বেদান্তের কচ্‌কচিতে সে ভক্তিভাব নষ্ট হওয়ার কথা আগেই বলা হয়েছে। বেদান্তের তর্ক বিচারের জন্য তিনি কেবল মনের মত পণ্ডিত খুঁজে বেড়াতেন। ১৩১৮ বংগাব্দে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। ১৩২২ বংগাব্দে তিনি সপরিবারে কাশীধামে বেড়াতে যান এবং ঐ তর্ক করার জন্য পণ্ডিতের খোঁজ করেন। তখন রসিকবাবু নামে এক ভদ্রলোক তাঁকে বলেন যে তিনি যদি নীরস তর্ক করে মনের চাঞ্চল্য অশান্তি বাড়াতে চান ত যান পণ্ডিতপ্রবর সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর কাছে, আর আধ্যাত্মিক সাধনায় মনের সরস শান্তি বাড়াতে চান ত আসুন সাধক প্রবর সীতারাম তত্ত্বনিধির কাছে।

তারপর হতেই ঠাকুর শ্রীসতীরঞ্জনের জীবন প্রবাহের গতি পরিবর্তিত হয়ে গেল। তিনি উপস্থিত হলেন সাধকপ্রবর সীতারাম

তত্ত্বনিধির কাছে এবং অধ্যাত্ম আলোচনায় তাঁর অন্তরে শান্তির অমৃত নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হয়ে গেল। কোথায় গেল তখন তাঁর পাণ্ডিত্যের অভিমান আর কোথায় গেল তাঁর বাদ-বিতণ্ডা-বিতর্ক স্পৃহা। যেন অন্য মানুষ হয়ে গেলেন তত্ত্বনিধি মহাশয়ের নিকট এই দীক্ষাগ্রহণের পর।

কাশীধাম হতে নিজের গ্রামে ফিরে এসে তিনি জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে একটি দলগঠন করে প্রতিদিন সন্ধ্যায় হরিনাম সংকীর্তনে মেতে উঠলেন। ভক্তিমার্গের সাধনায় আবার ডুবে গেলেন। কীর্তনের সময় তাঁর ভাবসমাধি হ'তে লাগল। ভক্তিরসের গান শুনে তাঁর ভাবসমাধি সমসাময়িক অনেকে লক্ষ্য করেছেন। তাঁর এই ভাবসমাধি স্বচক্ষে দেখে আমাদের মত অতি পাষণ্ডদেরও মনে অন্ততঃ সাময়িকভাবে ভগবদ্‌ভাবের সঞ্চার হয়েছে—একথা সমসাময়িক অনেকে জানেন।

তখনকার দিনে সমাজে অস্পৃশ্যতা বা উচ্চনীচ ভেদাভেদ খুব প্রবল ভাবে বর্তমান ছিল। তাঁর হরিনামের দলে সকল শ্রেণীর লোক থাকায় এবং তিনি সকলের সঙ্গে অবাধে মেশামেশি করায় সমাজের কয়েকজন তথাকথিত সম্মানী লোক তাঁকে 'ছোটলোকদের সঙ্গে মিশে তাঁর আত্মসম্মান নষ্টের জন্য ও ছোটলোকদের মাথায় তুলে সমাজের সর্বনাশ করার জন্য অনেক সদুপদেশ (?) দেন। কিন্তু তিনি তাঁদের বুঝিয়ে দেন যে এতে তাঁর নিজের এবং সমাজের উপকারই হচ্ছে। তাঁর ক্ষুরধার যুক্তির কাছে সকলকে হার মানতে হয়। এই ভাবে সুযুক্তির সাহায্যে তিনি আজীবন শাস্ত্রীয় সুসংস্কারের বিজ্ঞানসম্মত যুগোপযোগী ব্যাখ্যা করে পালন করতে

এবং লোকাচারের কুসংস্কারের গণ্ডী ছাড়তে উপদেশ দিয়ে গেছেন ও নিজে করে গেছেন।

সমাজেরও সাধারণের মধ্যে তথাকথিত শিক্ষিতদের মনে প্রকৃত ধর্মভাবের অভাব ও মানব প্রেমের অভাব তাঁকে অত্যন্ত বিচলিত করে। সমাজের প্রতিটি স্তরে তিনি প্রত্যক্ষভাবে মিশে লক্ষ্য করলেন যে, বড় ছোটকে ঘৃণা করে আর ছোট বড়কে করে বিদ্বেষ। এই ঘৃণা-বিদ্বেষের মূল কারণ সম্বন্ধে তিনি গভীরভাবে চিন্তা করে বুঝলেন—শিক্ষাদান পদ্ধতির মধ্যে ধর্মভাবের অভাবই এর মূল কারণ; আবার হিন্দুধর্মের মূল, প্রচারকের নিজস্ব অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সব বুঝে তিনি স্থির করলেন ধর্মের সাধনায় নিজে উন্নত অনুভূতি লাভ করে যুক্তির সাহায্যে তাঁর বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষা দানের মধ্য দিয়ে সুকৌশলে ধর্মভাবের প্রচার করবেন। সেই ভাবের সাধনায় তাঁর জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেকে উৎসর্গ করলেন। তাঁর নিজস্বভাষায় বলা যায়—'তিনি সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করে নিয়ে ছাত্রদের শিক্ষাদানের মধ্যে 'বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে' ধর্মভাব 'injection' করে অনুপ্রাণিত করতে লাগলেন। পরে বিদ্যালয়ের গণ্ডী ছাড়িয়ে ব্যাপকভাবে তাঁর এই ধর্মপ্রচার চলতে থাকে। সামাজিক শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকর্মে অর্থাৎ বিবাহ, উপনয়ন, বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ ইত্যাদিতে স্বেচ্ছায় যোগদান করে শাস্ত্রীয় মন্ত্র সমূহের ব্যাখ্যা ও তার যুগানুযায়ী উপযোগিতা সম্বন্ধে প্রচার করতে লাগলেন। নিকটবর্তী কারও মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়েছে জানতে পারলে তিনি নিজে তৎক্ষণাৎ মুমূর্ষুর নিকট উপস্থিত হয়ে অধ্যাত্ম আলোচনায় পারলৌকিক উন্নতির ব্যবস্থার চেষ্টা করতেন।

ঠাকুর শ্রীসতীরঞ্জন নিজস্ব সাধননির্মল বুদ্ধিতে অনুভব করলেন যে, স্বীয় অনুভূতি ভিন্ন ধর্মালোচনা বিফল। আরও বুঝলেন, জীবনে ধর্মের কোন ভাব প্রতিফলিত করার চেষ্টা না করে কেবল বহু শাস্ত্র মৌখিক আলোচনা করলে জগতে কোন আধ্যাত্মিক সুফল হয় না। তাতে 'দর্বী পাকরস যথা' অর্থাৎ ময়রার হাতার মত বহু মিষ্টি পাক করেও নিজে মিষ্ট রস থেকে বঞ্চিত থাকার ন্যায় অবস্থা হয়। এ সম্পর্কে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের উপদেশামৃত স্মরণে আসে—'এক ছটাক ধর্ম বিশ্বাস আর অনুভূতি একশ মণ ধর্মের আলোচনার চেয়ে অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ।' তাঁর গুরুদেবের আদেশে এবং নিজের আগ্রহে তিনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা ভাষ্য বাদ দিয়ে গীতা অনবরত অনুধ্যান ও অনুস্মরণ করতে লাগলেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। পূর্বের পড়া শাস্ত্রজ্ঞান সমন্বয়ে এই গীতার অবিরত স্মরণ মননে তাঁর অন্তরে নূতন যুগোপযোগী গীতার ভাব অর্থ প্রকাশিত হ'তে লাগল। এবং বাহিরে তাঁর প্রতিটি কাজে কর্মে শ্রীগীতার ভাব অনুসরণের চেষ্টা চলতে লাগল। অন্তরে বাহিরে তিনি যেন গীতাময় হয়ে গেলেন। শিক্ষাদানের সময় সব বিষয়ে বিশেষ করে ইংরাজী ব্যাকরণের (Grammar) সঙ্গে গীতার সামঞ্জস্য বিধান করে শিক্ষা দিতে লাগলেন। মাঝে মাঝে পৃথকভাবে গীতা পাঠের ক্লাস করতে লাগলেন। সাধক অশ্বিনী কুমার দত্তের 'ভক্তিযোগ, পুস্তকটিরও আলোচনা করতে থাকেন। এই ভাবের আলোচনায় তিনি কয়েকজনকে অধ্যাত্ম সাধনায় উদ্বুদ্ধ করে উচ্চতর পথে প্রেরণ করেন। বিদ্যালয়ের গণ্ডীর মধ্যে শিক্ষাদানরত থেকে যেমন টেস্ট পরীক্ষা সহায়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ করিয়ে ছাত্রদের শিক্ষার

উচ্চতর ধাপে মহাবিদ্যালয়ের পাঠে প্রেরণ করতেন, তেমনি তিনি নিজে সংসার আশ্রম থেকেও কয়েকজনকে অধ্যাত্ম শিক্ষা ও পরীক্ষা-সহায়ে উচ্চতর ধাপে সন্ন্যাস আশ্রমের পথে প্রেরণ করেন। তাঁদের মধ্যে শ্রীমৎ স্বামী বিশ্বানন্দ, শ্রীমৎ অকিঞ্চনানন্দ, শ্রীমৎ বাঙ্গালী বাবা প্রভৃতি অন্যতম। তিনি নিজে জীবনে কাউকে দীক্ষা দেন নাই। অপর মহাত্মাদের কাছে প্রেরণই ছিল তাঁর কাজ।

সৌভাগ্যের বিষয় এই সময় হুগলী জেলায় ডুরমুদহ উত্তম আশ্রমের তৎকালীন আচার্য শ্রীমৎ ধ্রুবানন্দজীর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। এই মিলন মণিকাঞ্চন যোগের ন্যায় অপূর্ব হয়েছিল। তিনি অনেক ভক্তকে ডুমুরদহ উত্তমাশ্রমে প্রেরণ করতে লাগলেন।

তিনি ঘরসংসারকে ধরে থাকার চেষ্টা করলেও শ্রীভগবানের ইচ্ছায় সংসারই তাঁকে ছাড়তে থাকে। তিনি ঐহিক তুচ্ছ সুখের আশায় বিবাহ ক'রে সংসার পাতবার চেষ্টা করলেও তা স্থায়ী হ'ল না। ১৩৩০ বংগাব্দে তাঁর স্ত্রী এক শিশুপুত্র ও এক শিশুকন্যা রেখে অকালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পূর্বে আর একটি কন্যা মাত্র ছিল, তাঁর বিবাহ জামালপুরেই দিয়েছিলেন। আবার ১৩৩২ বংগাব্দে তাঁর একমাত্র পাঁচ বৎসর বয়স্ক গোপালানন্দ নামে পুত্রটি ইহজগৎ ত্যাগ করল। তিনি কিন্তু মোহমুক্ত চিত্তে অবিচলিত-ভাবে নিজের কাজ করে যেতে থাকেন। সাংসারিক এসব ঝড়-ঝঞ্জায় একটুও বিচলিত হলেন না। তাঁর নিজের জীবনের ঘটনাগুলিকে উপলক্ষ করে ভক্তদের তিনি প্রায়ই উপদেশ দিতেন—'ছাড়ি শান্তিনিকেতন, কোথা শান্তি পাবে বল, সংসারে শান্তির আশা মরুভূমে যথা জল।' আবার গাইতেন—'আমি সংসারে

যে মন দিয়েছিনু, তুমি আপনি সে মন নিয়েছ, আমি সুখ বলে দুখ চেয়েছিনু, তুমি দুখ বলে সুখ দিয়েছ।' 'অনিত্যম্ অসুখং লোকম্ ইমন্ প্রাপ্য ভজস্ব মাম্'।

পূর্ব হতেই তিনি অত্যন্ত অনাসক্তভাবে সংসার জীবন যাপন করতেন এবং ঘরসংসার ও গ্রামের কোলাহলের বাইরে জামালপুর বি, পি, রেল স্টেশনের কাছে ফাঁকা মাঠে নির্জন নিরিবিলি জায়গায় একান্তে সাধন-ভজনের জন্য একটি কুঠিয়া তৈরী করাচ্ছিলেন। পুত্রের মৃত্যুর পর তাঁর সংসারের শেষবন্ধন যেন ছিন্ন হয়ে গেল। এক আত্মীয়ার উপর শিশুকন্যার ভার দিয়ে ১৩৩৩ বংগাব্দে বৈশাখ মাসে তাঁর নবনির্মিত ভজন আশ্রমে বা সাধন কুঠিয়ায় চলে এলেন এবং নিজ হাতে কাপড় কাচা বাসন মাজা হ'তে রান্না পর্যন্ত নিজের সব কাজ সেরে যথারীতি শিক্ষকতা ও ধর্মপ্রচার এবং একান্ত সাধনে মন দিলেন। আহার-বিহারে সবরকমের বিলাসিতা ত্যাগ করলেন একেবারে।

বিদ্যালয় বন্ধের সময় সৎসঙ্গ ও সদালোচনা করার ইচ্ছায় ডুমুরদহ উত্তম আশ্রমে, জাড়গ্রাম তপোবন আশ্রমে, ইলামপুর শ্রীমানপুরের সংযোগস্থলে গীতাশ্রমে মাঝে মাঝে এসে থাকতেন। গীতাগতপ্রাণ ঠাকুর শ্রীসতীরঞ্জন গীতা ব্যাখ্যার সুযোগ পেলে বহুদূরে চলে যেতেন এবং ভক্ত শ্রোতাদের নিয়ে আনন্দ করতেন। এইভাবে ভদ্রেশ্বরের গঙ্গাতীরে সত্যাশ্রমে গিয়ে কিছুদিন সদালোচনা করেছিলেন। তবে সহরের কোলাহলে যেতে বিশেষ ইচ্ছুক ছিলেন না।

অনুরক্ত বিদগ্ধ সমাজের অনুরোধে তিনি তাঁর আজীবন স্বাধ্যায়

সাধন লব্ধজ্ঞান গীতার একটি অভিনব অসাম্প্রদায়িক যুগোপযোগী ব্যাখ্যা রচনা লেখনীবদ্ধ করলেন। ১৩৫২ বংগাব্দের বৈশাখ মাসের মধ্যে এই রচনা সমাপ্ত করলেন। এর পূর্বেই 'রামলীলামৃত' নামে এই অধ্যাত্ম পুস্তকটি রচনা করেছিলেন। ১৩৫৭ বংগাব্দের ফাল্গুণ মাসে ইংরাজী ১৯৫০ খৃঃ অব্দে তাঁর ব্যাখ্যা সম্বলিত শ্রীশ্রীগীতামৃত মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন বিখ্যাত পত্র-পত্রিকায় ও রেডিয়োতে ভগবদ-ভক্তিমান অধ্যাপক খগেন্দ্র নাথ মিত্র কর্ত্তৃক এই পুস্তকটি উচ্চ প্রশংসিত হয়।

এর মধ্যে ১৯৪৯ খৃঃঅব্দে তাঁর সুযোগ্য ছাত্র ও বহুদিনের সহকর্মী শ্রীকালীকৃষ্ণ মিত্রকে চকদীঘি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকতার কার্যভার বুঝিয়ে দিয়ে পদত্যাগ করেন। পরে আর কিছুদিন সিপ্তাই মহুলা সতীরঞ্জন বিদ্যাপীঠে বেতন না নিয়ে শিক্ষকতা করে-ছিলেন তা পূর্বেই বলা হয়েছে। এই সময় হতে প্রায় স্থায়ীভাবে বসবাস করবার জন্য গীতাশ্রমে চলে আসেন। উক্ত ১৯৫৯ খৃঃঅব্দে তাঁর সঞ্চিত শেষ সম্বল দশ হাজার টাকা দিয়ে একটি ভাণ্ডার স্থাপন করলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেবা সমিতি নাম দিয়ে এগারজন সদস্য মনোনীত করে তাঁদের নির্দেশ দিয়ে গেলেন যে ঐ অর্থের সুদ হতে এই অঞ্চলের দুঃস্থদের সাহায্য করা হবে। তাঁর সে নির্দেশ এখনও পালিত হয়ে থাকে।

তাঁর উপর শ্রীভগবানের ন্যস্ত কাজের সব ভার যেন শেষ হয়ে গেল। ১৯৫১ খৃঃঅব্দে তাঁর গলার গ্ল্যাণ্ডে রোগের প্রথম সূত্রপাত হল। জীবনে তাঁর অসুখ বিসুখ খুব কমই হয়েছে। কিন্তু এই ক্যান্সার রোগ ক্রমশঃ বেশি হতে লাগল। তাঁর সুযোগ্য অধ্যাত্ম-

ছাত্র শ্রীমৎ স্বামী বিশ্বানন্দজীকে হরিদ্বারের নিকট হৃষিকেশের আশ্রম হতে আনান হল। তাঁর সেবায় ও সৎসঙ্গে বাকী জীবনটি কাটিয়ে ১৯৫২ খৃঃঅব্দে ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৩৫৮ বংগাব্দের ২৬শে মাঘ শনিবার রাত্রি ১২-৪০ মিনিটের সময় শুভ পুষ্যা নক্ষত্রে মরজগৎ ত্যাগ করে চলে গেলেন।

তিনি চলে গেলেন—আর রেখে গেলেন পুণ্য স্মৃতি, পুণ্য প্রভাব, গীতামৃত ও রামলীলামৃত এবং তাঁর ভাবধারার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী শ্রীমৎ স্বামী বিশ্বানন্দজী।

এই স্বামীজীর ঐকান্তিক প্রেরণায় সাধারণের চেষ্টায় গীতাশ্রমে তাঁর মরদেহের শেষকৃত্যের স্থানে একটি স্মৃতি মন্দির নির্মিত হয়েছে। সেখানে নিত্য পূজা হয় ও প্রতি বৎসর তিরোভাব তিথিতে উৎসবে বহু ছাত্র ভক্তবৃন্দের সমাবেশ হয় এবং আবির্ভাব তিথিতে তাঁর স্মৃতিপূত সিপ্তাই সতীরঞ্জন বিদ্যাপীঠে জন্মোৎসব পালিত হয়ে থাকে।

আমার পূর্বজন্মের অশেষ সুকৃতি বলে ঠাকুর শ্রীসতীরঞ্জনের দিব্য জীবনের শেষ কয়েক বৎসর ঘনিষ্ঠ সেবকরূপে তাঁর সৎসঙ্গের সুযোগে ধন্য হই। তাঁর মুখে তাঁর কথামৃত শুনে কিছু কিছু লিখে রেখেছিলাম নিজস্ব অনুস্মরণে নিজস্ব পুণ্যলাভের আকাঙ্ক্ষায়। পূজনীয় গুরুদেব শ্রীমৎস্বামী বিশ্বানন্দজীর আদেশে এই পবিত্র চরিত্র মাহাত্ম্য কীর্তন করেছি—গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা সেরেছি। হয়ত নিজের অজ্ঞাতসারে বুদ্ধিমালিন্য দোষে সে গঙ্গাজলে কিছু ঘোলা জলও মিশিয়ে ফেলেছি তার জন্য সুধী ভক্তজনের মার্জনা প্রার্থনা করি।

অপার মহাসমুদ্রের মত সে মহাজীবনের উদ্দেশ্যে সমুদ্রে পাদ্য-অর্ঘ্য দেবার মত এই ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র। ঠাকুর শ্রীসতীরঞ্জনের সুপবিত্র ভাবধারার কিছুমাত্র প্রকাশেরও আমার সাধ্য কোথায়? তাঁরই আশীর্বাদে তাঁরই কৃপায় পঙ্গুর গিরি লঙ্ঘনের মত মূক বাচাল হয়ে এই অর্ঘ্য সমর্পণ করলাম—

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে ঠাকুর শ্রীসতীরঞ্জনম্।

ওঁ তৎসৎ

ইলামপুর,
ডাকঘর—পাড়াতল (বর্ধমান)
৺রাসপূর্ণিমা, ১৩৬৮ বংগাব্দ

—তারাশঙ্কর ঘোষ

মুখবন্ধ

মহামুনি বাল্মীকি রচিত মহাকাব্য রামায়ণের দুই প্রকার ব্যাখ্যা হইতে পারে। একটি ঐতিহাসিক, অপরটি আধ্যাত্মিক। প্রথম ব্যাখ্যা অনুসারে রামায়ণ আদর্শ চরিত্র রাজার জন্ম-কর্ম্ম, শৌর্য্যবীর্য্য, সত্যনিষ্ঠা, প্রজা বাৎসল্য, স্বার্থত্যাগ ও জনহিত সাধনা, সাধ্বী স্ত্রীর ঐকান্তিকী পতিভক্তি ও আত্মত্যাগ, ভ্রাতার অতুলনীয় ভ্রাতৃপ্রেম ও অনলস ভ্রাতৃসেবা, মহাবীরের মহীয়সী প্রভুভক্তি ও রাজসেবা প্রভৃতির সুললিত ছন্দোবদ্ধ বর্ণনা। দ্বিতীয় ব্যাখ্যানুসারে রামায়ণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপযোগী শিক্ষাদীক্ষা, তাহার সাধনপথ, পরব্রহ্ম ও পরাপ্রকৃতির স্বরূপ বর্ণনা ও বিচার সম্বলিত অধ্যাত্মশাস্ত্র।

"রামলীলামৃত"-গ্রন্থে স্বর্গত শ্রদ্ধেয় সতীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গভীর পাণ্ডিত্য ও তত্ত্বদৃষ্টি রামায়ণের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় নিয়োজিত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া তিনি দেখাইয়াছেন, শ্রীরামচন্দ্রের দিব্যজীবন তৎকালীন ভারতে বিপন্ন ও বিপর্য্যস্ত ব্রহ্মবিদ্যার সাধন ও সিদ্ধি, সংরক্ষণ ও সংস্থাপন, প্রচার ও প্রসার। রামায়ণের অন্যান্য চরিত্রের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া তিনি প্রতিপাদন করিয়াছেন যে ইহাতে নিষ্কাম কর্মযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগের পরাকাষ্ঠার নিদর্শন পাওয়া যায়। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে ইহাতে ধর্মজগতে বিভিন্ন অধিকারীর জন্য বিভিন্ন ভাবের ও মার্গের নির্দেশ আছে। ইহা হইতে সাধন রাজ্যের বিভিন্ন স্তরের লোক সমভাবে অনুপ্রেরণা পাইবেন এবং তাঁহাদের

সকলেই উদ্বুদ্ধ হইবেন ও আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি লাভ করিবেন। রামায়ণের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, সংসারাসক্ত ব্যক্তির ভোগাসক্তি দূর হয় এবং মোক্ষেচ্ছার উদয় হয়, আর্ত্তের আর্ত্তিনাশ হয়, জিজ্ঞাসুর জ্ঞানলাভ হয় এবং জ্ঞানীর বিজ্ঞানরূপী ব্রহ্মানুভূতিও হইতে পারে। "রামলীলামৃত" রামায়ণের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে শ্রদ্ধাবান্ ও সেবাপরায়ণ পাঠককে প্রভূত সাহায্য করিবে।

ইহা একটি উপাদেয় ও মহোপকারী গ্রন্থ। ইহাকে ব্রহ্মবিদ্যার সবিস্তার আলোচনা বলা যায়। এই গ্রন্থ সকল ধর্মজিজ্ঞাসু ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তির অবশ্য পাঠ্য ও কল্যাণকর মনে করি।

কলিকাতা—৩০ ভাদ্র, সন ১৩৬৮ ঃ
ইং ১৫।৯।১৯৬১

শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
এম এ, পি-এচ্ ডি।
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ, যুক্তরাষ্ট্রস্থ হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতির ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

রামলীলামৃত

রত্নাকরের বাল্মীকিত্ব লাভ

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥
যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নি র্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্ম্মানি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ গী ৪.৩৭—৩৮

"যদি তুমি সকল পাপী অপেক্ষা ভীষণ পাপী হও জ্ঞান উৎপন্ন হইলে ঐ জ্ঞানরূপ তরণী দ্বারা সমস্ত পাপসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। যেমন সম্যক প্রজ্বলিত অগ্নি সমস্ত ইন্ধনকে ভস্মসাৎ করে। জ্ঞানরূপ অগ্নিও সমস্ত সঞ্চিত কর্ম্মকে সেইরূপ দগ্ধ করিয়া ফেলে। গীতার এই গভীর তথ্যের রত্নাকরই বিশেষরূপ দৃষ্টান্ত। রত্নাকর রূপে ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি অতি ঘৃণিত দস্যুবৃত্তি ও নরহত্যা কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন, কিন্তু উপযুক্ত গুরুর সাহায্যে বিবেকের উদয়ে তিনি কঠিন তপস্যা দ্বারা সেই জন্মেই জ্ঞান লাভ করতঃ ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিতে পরিণত হইলেন। কিন্তু যে যথার্থ আসুরিক ভাবাপন্ন ও মহাপাপী তাহার বিবেক বা তজ্জনিত

ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হওয়া কিরূপে সম্ভবপর হয়? গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে ভগবান বলিয়াছেন :—

"তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব জনিষু॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাংগতিং॥

—গী ১৬।১৯—২০

অর্থাৎ সংসারের সমস্ত প্রাণীর শত্রু ক্রূর প্রকৃতি নরাধমগণকে অজস্র অশুভ আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করিয়া থাকি। সেই সমস্ত মোহগ্রস্থ ব্যক্তিগণ আসুরী যোনি প্রাপ্ত হইয়া প্রতি জন্মে নীচ কার্য্য করিতে করিতে আমাকে প্রাপ্তির পথ হইতে বিভ্রষ্ট হইয়া উত্তরোত্তর অধমা গতি লাভ করিতে থাকে।

কিন্তু যথার্থ পাপী ও পুণ্যবান চিনিবার ক্ষমতা আমাদের মত সাধারণ জীবের নাই। আমরা মানুষকে তাহার বর্ত্তমান কালের কর্ম্ম দেখিয়া পাপী বা পুণ্যবান মনে করি। কিন্তু যোগিগণ জ্ঞান-নেত্র দ্বারা মানুষের পূর্বজন্মের, বর্ত্তমান জন্মের পরবর্ত্তীকালের ও আগামী জন্মের কর্ম্ম দেখিয়া তাঁহাকে পাপী বা পুণ্যবান বলিয়া বুঝেন। এই রত্নাকর যে এরূপ ঘোর পাপী, তাহার বিবেক উদিত হইল কিরূপে? প্রকৃতপক্ষে মহাপাপী কখনও ভগবদ্ভাব বা ব্রহ্মভাব আয়ত্ত করিতে পারে না। এই রত্নাকর পূর্ব পূর্ব জন্মে মহাসাধক ছিলেন, তিনি উত্তরোত্তর উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া সাধনার উন্নত ভূমিকায় আরূঢ় হইয়াছিলেন। তাঁহার গত জন্মের মৃত্যুর পূর্বে হঠাৎ কোনও

অসৎ চিন্তা তাহার মনে উদিত হওয়ায় তিনি যোগভ্রষ্ট হন। তাহার ফলে তাঁহাকে প্রথমে দস্যুতা, নরহত্যা ইত্যাদি ঘৃণিত কার্য্যে লিপ্ত হইতে হয়। কিন্তু যেদিন তাঁহার পূর্বজন্ম কৃত অসচ্চিন্তা প্রসূত কর্ম্মের ফলে এ জন্মে নানা দুষ্কৃতির দ্বারা দারুণ যন্ত্রণা ও অনুতাপ আসিল, ঠিক সেই সময় ভগবান তাঁহার জ্ঞানোন্মেষের জন্য ব্রহ্মা ও নারদরূপ উপযুক্ত গুরুকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা পথিক বেশে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবামাত্র রত্নাকর তাঁহাদের বধের জন্য দণ্ড উদ্যত করিলে তাঁহারা তাঁহাকে ঐ ঘোর পাপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন যে পিতা, মাতা, ও স্ত্রীপুত্রের প্রতিপালনের জন্য তিনি ঐ কার্য্য করিতেছেন। এবং ঐ কার্য্যে তাঁহার পাপ হইলে, পিতা, মাতা প্রভৃতি সেই পাপের অংশ গ্রহণ করিবেন।

তখন ব্রহ্মা তাঁহাকে তাঁহার বাটীতে যাইয়া পিতামাতা প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করিতে পাঠাইলেন, রত্নাকরের কৃত পাপের তাঁহারা অংশ গ্রহণ করেন কিনা? রত্নাকরের প্রশ্নে তাঁহার পিতামাতা স্ত্রী ও পুত্রগণ সকলেই তাহার ঐ সমস্ত পাপের অংশ গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন এবং বলিলেন পিতামাতা স্ত্রী-পুত্রকে প্রতিপালন মানুষের অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐ প্রতিপালন জন্য মানুষ ধর্ম্মতঃ বাধ্য। তিনি যদি অসদুপায়ে ঐ কার্য্য সম্পাদন করেন তবে তাহার ফল তিনি নিজে ভোগ করিবেন। অন্য কেহ তাঁহার পাপের ভাগী হইবেন কেন? এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রত্নাকরের কৃত কর্মের জন্য দারুণ অনুতাপ আসিল। তিনি ছুটিয়া আসিয়া পথিক বেশী মহাপুরুষদ্বয়কে আপনার দেহ মন সমর্পণ করিয়া তাঁহাদের চরণে লুটাইয়া পড়িলেন।

তাঁহাদের দত্ত সাধন প্রণালীতে পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া কঠিন তপস্যাদ্বারা পূর্ব্ব জন্মে যে ভূমিকা হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, সেই ভূমিকা হইতে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিয়া সেই জন্মেই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হইলেন। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন ঃ—

তত্রতং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকং।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন॥
পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবসোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দ ব্রহ্মাতি বর্ত্ততে॥
প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেক জন্ম সংসিদ্ধ স্ততো যাতি পরাং গতিং॥

গী ৬।৪৩— ৪৫

অর্থাৎ যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পর জন্মে সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ব-জন্মের আরূঢ় ভূমিকায় যথাকালে উপস্থিত হন। সেই অবস্থা হইতে উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। পূর্বজন্মের অভ্যাস বশতঃ তিনি অবশ ভাবে উন্নতির দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকেন। এবং পূর্বজন্মে ভগবজ্-জ্ঞানের ইচ্ছা উদিত হইলে, এ জন্মে আর তাঁহাকে কর্ম্ম কাণ্ডে প্রবেশ করিতে হয় না। উত্তরোত্তর সমধিক যত্নপরায়ণ হইয়া যোগী সমস্ত মালিন্য হইতে ক্রমশঃ মুক্ত হইয়া কয়েক জন্মেই পরম ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন।

এখন দেখিতে হইবে হঠাৎ ব্রহ্মা ও নারদ রত্নাকরের নিকট উপস্থিত হইলেন কেন? ইহা কি কাকতালীয়বৎ কার্য্য কারণ

ভাবহীন ? তাহা কখনই নহে। ভগবান সর্বদা সকল জীবের অবস্থা অবগত আছেন। তিনি গীতায় বলিয়াছেন :—

"বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন ॥" গী ৭।২৬

হে অর্জুন! আমি অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে উৎপত্তিমান সমস্ত জীবকে জানি। কিন্তু আমাকে কেহ জানে না। শুধু তিনি জানিয়াই নিশ্চিন্ত নহেন। তিনি দিবারাত্র অনলসসভাবে জীবের মঙ্গলের জন্য কর্ম করিতেছেন।

গীতায় বলিয়াছেন :—

"যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥" গী ৩,২৩

যদি আমি সর্বদা আলস্য বিবর্জ্জিত হইয়া কর্ম না করি তাহা হইলে মনুষ্যগণও সর্বদা আমার পন্থার অনুকরণ করিবে। অর্থাৎ তাহারাও অলসভাবে বসিয়া থাকিবে।

এখন পুরাণে দেখিতে পাই ভগবান আষাঢ় মাসের শুক্লা একাদশীতে শয়ন করেন ও কার্ত্তিকী শুক্লা একাদশীতে নিদ্রা হইতে উত্থান করেন। এই সমস্ত সময়ই তাহার নিদ্রায় কাটিয়া যায়, এবং দেবতারাও ছয় মাস নিদ্রিত থাকেন। এবং ছয় মাস জাগরিত থাকিয়া কর্ম্ম করেন। এ সমস্ত নিম্নস্তরের কথা। সাধারণ মনুষ্য নিজেদের গজকাঠিতে ভগবান ও দেবগণকে মাপিয়া নিজেদের ন্যায় তাঁহাদের আহার বিহার নিদ্রা কাম ক্রোধ ইত্যাদি কল্পনা

না করিয়া থাকিতে পারে না। কর্ম্ম কাণ্ড হইতে উন্নতস্তরে আরূঢ় সাধক জানেন, ভগবান ত দূরের কথা, স্বর্গলোকবাসী ত্রিভূবন পালক দেবগণও কখনও আলস্য বা নিদ্রাগ্রস্থ হন না। তাঁহারা সর্ব্বদা জগতের জীবের মঙ্গলের জন্য অবিশ্রান্তভাবে কার্য্যাদি করিতেছেন। ভগবান যখন বুঝিলেন. রত্নাকরের যোগভ্রংশকারী দুষ্কৃতির শেষ হইয়াছে ঠিক সেই সময়ে তিনি ব্রহ্মা ও নারদরূপী গুরুদ্বয়কে তাহার নিকট প্রেরণ করিলেন। তিনি চিরকালই ইহা করিতেছেন। তাঁহার কাজই এই। যে ব্যক্তির যেমন আধ্যাত্মিক অবস্থা তাহা তিনি সর্বদাই জানিতেছেন। কাহার কিরূপ গুরু কখন আবশ্যক, কাহার কোন কর্মের দ্বারা উন্নতি হইবে, ইত্যাদি তাঁহার নখদর্পণে। আধুনিক কালেও বিল্বমঙ্গল, জগাই মাধাই ও লালাবাবুর আধ্যাত্মিক উন্নতি ইহার দৃষ্টান্ত। ইহারা সকলেই ইহজন্মে প্রথমে ঘোর দুষ্কৃতিপরায়ণ ছিলেন। কিন্তু যেন হঠাৎ ভগবন্মার্গে উন্নীত হইয়া পরম ভক্তিমান হইলেন। কেহ যেন মনে না করেন যে দস্যুতা, ব্যভিচার, মদ্যপান ও বিলাসিতা করিয়া ছিলেন বলিয়াই ভগবান রত্নাকর, বিল্বমঙ্গল, জগাই মাধাই ও লালাবাবুকে উপযুক্ত গুরু পাঠাইয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন, ইঁহারা সকলেই পূর্বজন্মে বিশেষ উন্নত ছিলেন, কেবল পূর্বজন্মের কোন দুষ্ট কর্ম্ম করার জন্য যোগভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। উন্নত না হইলে কি কখনও কাহারও মনে বিবেকের উদয় হয়? সামান্য পাপ থাকিলেও তাহা যতক্ষণ না স্খলিত হয় ততক্ষণ সাধনের আবশ্যকতা আছে। সেইটুকু শেষ হইলে তাঁহারা জ্ঞান-ভূমিতে আরূঢ় হইয়া উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিয়া পরিশেষে

পরম পদ প্রাপ্ত হন। রত্নাকরের চিত্তে গুরুপ্রদর্শিত উপদেশে পূর্বজন্মের বিবেক বৈরাগ্যের আবির্ভাব হইল। তিনি কঠোর তপস্যা প্রত্যাহার ধারণা ও ব্রহ্মধ্যান আশ্রয় করিয়া কিছু দিনের মধ্যে শুভেচ্ছা, বিচারণা ও তনুমানসা নাম্নী তিন জ্ঞানভূমি অতিক্রম করিয়া সত্তাপত্তি নাম্নী চতুর্থী জ্ঞান ভূমিতে আরূঢ় হইলেন। ধ্যানের তীব্র অভ্যাসে সমাধি অবস্থায় তাহার দেহে বল্মীক উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া তিনি "বাল্মীকি" আখ্যা প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণ স্বার্থপর হন না। তাঁহারা যে মহামূল্য সম্পত্তি লাভ করেন তাহা মনুষ্য মধ্যে বিতরণের জন্য সর্ব্বদা আগ্রহান্বিত হন।

তাঁহারা সর্বভূত হিতে রত। বাল্মীকি মনুষ্যের উদ্ধার কামনায় তাঁহার অলৌকিক মহাকাব্য "রামায়ণ" রচনা করিলেন। সমস্ত শক্তিই সেই সর্বশক্তিমান ভগবানের প্রদত্ত। যাহাতে মনুষ্য ঐহিক ও পারত্রিক ভোগরাশি উপেক্ষা করিয়া পরমপদ লাভে কৃতার্থ হয় সেইজন্য রামায়ণ রচনার প্রেরণা আসিল। সাধারণ কবির কাব্য ব্রহ্মজ্ঞ ঋষির প্রণীত কাব্যে মহান ব্যবধান থাকে। সাধারণ বা লৌকিক কবি কালিদাস, ভবভূতি, সেক্‌সপিয়র; মিলটন্ প্রভৃতি। ইহারা লোকের মনে ঐহিক স্ত্রী পুরুষের প্রণয়ের আনন্দ, স্বাভাবিক নিয়মলঙ্ঘনে দুঃখ, সমাজানুমোদিত জীবন যাত্রার নিয়মাবলি পালনে সুখ. পাপ পুণ্য ভোগের চিত্র এবং স্বর্গ সুখ পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়া ভোগাসক্ত সাধারণ মানবের চিত্ত বিনোদন করিয়া যশোলাভ করিতে চাহেন। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণ ঐহিক সুখ দুঃখের নশ্বরতা, স্বর্গ সুখের অল্পকালস্থায়িত্ব ও সমলত্ব ইত্যাদি প্রদর্শন করিয়া

মানুষকে মুক্তি পথে অগ্রসর হইতে লুব্ধ করেন। বাল্মীকির রামায়ণে যে যেমন পাঠক সে তেমনি ভাবে রসাস্বাদন করিতে পারিবেন। বিষয়াসক্ত ও স্বর্গসুখ ভোগাভিলাসী পাঠক ইহাতে সীতার সতীত্ব ও জীবের হিতের জন্য অপূর্ব ত্যাগ স্বীকার, রামের পিতৃভক্তি ও রাজার আদর্শ কর্ত্তব্য পালনে নিজ সুখে জলাঞ্জলি দান, লক্ষ্মণের অতুলনীয় ভ্রাতৃভক্তি, হনুমানের প্রভুভক্তি, বিভীষণের বন্ধুপ্রীতি, ভরতের কঠোর কর্ত্তব্য পালন, পাপীর পাপের শোচনীয় পরিনাম, ধর্ম্মের জয় ইত্যাদি পাঠ করিয়া আনন্দে নিজ নিজ চরিত্রগঠন করিয়া উন্নতি লাভ করিবেন। অপর পক্ষে উন্নত শ্রেণীর পাঠকগণ কি রূপে পরম পবিত্র ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া পরব্রহ্মে আপনার পৃথক অস্তিত্ব লোপ করিয়া পরম পুরুষার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার পূর্ণ সন্ধান পাইবেন। এই শেষোক্ত ভাবে রামায়ণ বর্ণিত চরিত্র এবং ঘটনাবলি ব্যাখ্যা করাই এই দীন লেখকের উদ্দেশ্য। সাধন বিহীনতা বশতঃ ক্রুটি বিচ্যুতি ঘটিলে মহানুভাব ব্যক্তিগণ ক্ষমা করিবেন।

রাবণাদি ভ্রাতৃত্রয়ের সাধনা ও সিদ্ধি—

রাবণাদি তিন ভ্রাতা মর্ত্তলোকের মানুষ ছিলেন। রাক্ষস বা রক্ষযোনি সম্ভূত নহেন। কারণ পৃথিবীতে রাক্ষসগণ বাস করেন না। তাহারা দেবযোনি বিশেষ এবং ভূবর্লোক তাঁহাদের আবাস স্থল। যথা ঃ—

বিদ্যাধরোঽপ্সরোযক্ষরক্ষোগন্ধর্ব-কিন্নরাঃ।
পিশাচো গুহ্যকঃ সিদ্ধঃ ভূতোঽমী দেবযোনয়ঃ॥

যে সকল মানব ভগবদ্ভক্তিহীন কঠিন তপস্যা দ্বারা বিশেষ শক্তি সিদ্ধি লাভ করেন, তাঁহারা ভূবর্লোকে যক্ষ রাক্ষসাদি দেব-যোনি প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস করেন। এই লোকে আয়ুঃ মনুষ্য পরিমাণের তিন সহস্র বৎসর। রাবণাদি তিন ভ্রাতা এই পৃথিবীরই মানুষ ছিলেন ইহা পূর্বে বলিয়াছি। ইহারা পূর্ব পূর্ব জন্ম হইতে প্রাপ্ত সংস্কারবশে তিন জন তিন প্রকার সাধনায় কঠিন ভাবে আত্মনিয়োগ করেন। ইহাদের মধ্যে বিভীষণ সর্ব কনিষ্ঠ। ইনি দৈবী প্রকৃতি সম্পন্ন এবং সত্ত্বগুণ যুক্ত—গীতোক্ত কর্মযোগ সাধনার দ্বারা পরিপক্ক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ধ্যান যোগে গীতার অষ্টম অধ্যায়োক্ত দেবযান মার্গদ্বারা মৃত্যুর পর সগুণ ব্রহ্মপ্রাপ্তি অর্থাৎ অমরত্ব প্রাপ্তির অধিকারী হইয়াছেন। এই অমরত্ব অর্থে যেন কেহ না বুঝেন যে এই পৃথিবীতে এই পার্থিব দেহ লইয়া তিনি অনন্ত কাল বিচরণ করিবেন। এইরূপ অমরত্ব অতি মুর্খ লোকে কামনা করে। যাহারা ভগবান্ বা দেবতা ইত্যাদি কিছুই মানেনা, সেই অজ্ঞানান্ধ তামসিক ব্যক্তিগণ পৃথিবীতে চিরকাল ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করিবার লালসায় বহুকাল এখানে বাঁচিয়া থাকিতে চায়। কিন্তু পৃথিবীতে কি যথার্থ সুখ পাওয়া যায়? ইন্দ্রিয় সুখ কতদিন স্থায়ী? কিছুদিন ভোগ করিলেই অবসাদ আসে এবং ঐ সমস্ত সুখ ক্রমশঃ দারুণ যন্ত্রণায় পরিণত হয়। কাম্য পদার্থ ভোগ করিয়া কে কোথায় সুখ পাইয়াছে। ভোগলালসা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয় এবং পৃথিবীর সমস্ত ধনরাশি ও স্ত্রীলোক পাইলেও তাহাতে অতৃপ্তিই থাকিয়া যায়। মহাভারতে যযাতি রাজা বলিয়াছেন :—

"যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
একস্যাপি ন পর্য্যাপ্তং তস্মাদতিতৃষং ত্যজেৎ ॥

পৃথিবীতে যত শস্য, স্বর্ণ, পশু ও স্ত্রী আছে, তাহা একজনের হইলেও পর্য্যাপ্ত হয় না, অতএব অত্যধিক কামনা ত্যাগ করা উচিত।

যথার্থ অমরত্ব পার্থিব দেহ কেন, কোনরূপ দেহ থাকিলে লাভ হয় না। মনুষ্যের তুলনায় স্বর্গের দেবতাকে অমর, তাহাদের তুলনায় ব্রহ্মলোকবাসীকে অমর এবং ব্রহ্মলোকবাসীদের তুলনায় নির্গুণ মুক্ত দিগকে অমর বলা হয়।

স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ ত্রিবিধ দেহসম্বন্ধ পরিত্যাগ ভিন্ন যথার্থ অমরত্বের অধিকারী হওয়া অসম্ভব। বিভীষণকে মৃত্যুর পর আর স্বর্গ বা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না। তিনি নিজকর্ম্ম প্রভাবে মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোকবাসের অধিকারী হইয়াছেন এবং যতদিন ব্রহ্মা জীবিত থাকিবেন, ততদিন উত্তরোত্তর জ্ঞানে উন্নীত হইয়া ব্রহ্মার মুক্তিতে অর্থাৎ তাঁহার মৃত্যুর পর নির্গুণ ব্রহ্মে লীন হইবেন। যথাঃ—

"ব্রহ্মণা সহতে সর্বে সংপ্রাপ্তে প্রতি সঞ্চরে।
পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্ ॥"

অর্থাৎ সত্যলোকবাসীগণ মহাপ্রলয় কালে ব্রহ্মার মৃত্যুর পর পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বিভীষণ স্বীয় কর্ম্ম প্রভাবে গীতোক্ত সাধনা সমাপন করিয়া বেদান্ত সাধনের শ্রেণীতে উন্নতি লাভ

করিতেছেন অর্থাৎ সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হইয়া উপনিষদের শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনে ব্রহ্ম দর্শন জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

রাবণ অসুর প্রকৃতি সম্পন্ন। তিনি রাজসিকতার পূর্ণ প্রতিমূর্তি। কঠোর তপস্যায় ভগদ্ভক্তি-বিহীন-ভাবে সাংখ্য ও পাতঞ্জল-প্রোক্ত বিধানে কঠিন যোগসাধনে তিনি অদ্ভূত শক্তি সিদ্ধি লাভ করিয়া স্বর্গমর্ত্তাদিলোকে যথেচ্ছ গতিবিধি, দেবতাদের ত্রিভুবন পালন কার্য্যে বাধা দান ও নিজ সিদ্ধি শক্তি প্রয়োগে পৃথিবীর অধিবাসী-দিগকে মুগ্ধ করিয়া ঐরূপ সাধন করিতে প্রবৃত্ত করায় দেবতাগণের যথার্থ ত্রাসের কারণ হইয়াছেন। কারণ দেবতাগণ সর্ব্বদা মানবগণের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য নানা ভাবে চেষ্টা করেন। ইহাই তাঁহাদের কার্য্য। রাবণ ও তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ দেবতাগণের ত্রিভুবন পালন কার্য্যে কিরূপ ঘোর বিঘ্ন আনয়ন করিয়াছিলেন তাহা পরে বর্ণিত হইবে।

কুম্ভকর্ণ রাক্ষস প্রকৃতি সম্পন্ন। ইনি তমোগুণের প্রতিমূর্ত্তি। প্রমোদ, আলস্য ও নিদ্রাই তমোগুণের কার্য্য। তন্ত্রোক্ত নিম্নশ্রেণীর অর্থাৎ অঘোর পন্থী কাপালিক ও বাউল শ্রেণীর সাধনায় অনেকগুলি পৈশাচিক ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। তমোগুণী লোককে পূর্ণভাবে বশীভূত করিতে ও আভিচারিক ক্রিয়া দ্বারা নিজ প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং কেবল রাশি রাশি ভোগ্য পদার্থ ভোগ ও নিদ্রাই তাঁহার নিকট উপাদেয়। সাধারণ মানবগণ এবং বনবাসী তপস্বীগণও এই দুই ভ্রাতার শক্তি সিদ্ধি দর্শন করিয়া তাঁহাদের প্রাপ্ত শক্তি সিদ্ধিই পরম পুরুষার্থ, এই ভ্রান্ত ধারণায় পথিভ্রষ্ট হইতেছেন। দেবতাগণ এই দুই জনের অসৎ কার্য্যাবলি

৩

দর্শন করিয়া জীবের দুঃখে ম্লান হইলেন। এই নিদারুণ অধর্মাচরণ হইতে পৃথিবীর মানবগণকে রক্ষা করিবার যথেষ্ট সামর্থ্য লাভ করিবার জন্য তাহারা দিবারাত্র ভগবৎ সাধনে ব্যাপৃত হইলেন।

ভগবানের অবতারগ্রহণ ও রামাদিরূপ জন্ম

গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন ঃ—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং।।
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।

গী ৪।৭—৮

হে অর্জ্জুন! যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয় তখন আমি আপনাকে সৃষ্টি করিয়া থাকি। সাধুদের পরিত্রাণের জন্য ও দুষ্কৃতিকারীদিগের বিনাশের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও তাঁহাদের শিষ্য প্রশিষ্যদের কার্য্যদ্বারা ও তাঁহাদের রাজসিক ও তামসিক সিদ্ধির প্রভাবে পৃথিবীতে ভগবদ্ভক্তি ও ব্রহ্মজ্ঞান লোপ হইতে আরম্ভ হইল। কাজেই ভগবানকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতে হইল।

সূর্য্যবংশে দশরথ নামে এক কর্ম্মযোগ কুশল রাজা ছিলেন। অযোধ্যায় তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি বংশপরম্পরাক্রমে

গীতোক্ত কর্ম্মযোগমার্গে দীক্ষিত ছিলেন। দ্বাপর যুগের শেষে ভগবান অর্জ্জুনকে উপলক্ষ করিয়া গীতা ধর্ম্ম প্রচার করিলেও ভগবান মনুষ্য সৃষ্টির সময়ে সত্য যুগের প্রারম্ভে প্রথম রাজা সূর্য্যকে ঐ যোগ শিক্ষা দিয়াছিলেন। যথা ঃ—

"ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ং।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষাকবেঽব্রবীৎ ॥
এবং পরম্পরা প্রাপ্তমিদং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥

গীতা ৪।১—২

অর্থাৎ এই পরম কল্যাণকর যোগ (গীতোক্ত কর্ম্মযোগ) আমি সূর্য্যকে বলিয়াছিলাম। সূর্য্য তাঁহার পুত্র মনুকে বলিয়াছিলেন এবং মনু তাঁহার পুত্র ইক্ষ্বাকুকে এই যোগের উপদেশ দিয়াছিলেন। এইরূপ বংশ পরম্পরায় ও শিষ্য পরম্পরায় এই যোগ রাজর্ষিগণ জানিতেন। অনেক দিন গত হওয়াতে এই যোগ এখন (দ্বাপরের শেষে) সংসার হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। দশরথ নিজ পিতা মহারাজ অজের নিকট কর্ম্মযোগ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া সংসারে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। অসুরগণের সহিত সংগ্রামে দেবগণ তাঁহার সাহায্য অতি আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতেন। এবং তিনি ঐ সাহায্য সকল সময়েই করিতেন। এখন দেবাসুর সংগ্রামের আধ্যাত্মিক অর্থ কি? স্বর্গের ইন্দ্র চন্দ্রাদি দেবগণ ব্রহ্মার প্রতি প্রাতঃকালে অর্থাৎ এক এক কল্পের আরম্ভে ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্ট হন এবং কল্পান্ত-যাবৎ অর্থাৎ মনুষ্য

পরিমাণের চারিশত বত্রিশ কোটী বৎসর ত্রিভুবনের পালন কার্য্যে রত থাকেন। ইঁহারা সর্ব্বদা ভগবৎসাধনে রত। স্বার্থ বা ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়ে আসক্তি তাঁহাদের বিন্দুমাত্র নাই। কেবল ত্রিভুবনের মঙ্গল বিধানই তাঁহাদের একমাত্র কার্য্য। যখনই পৃথিবীতে আসুরিক ও রাক্ষসিক অর্থাৎ রাজসিক ও তামসিক ভাবের প্রাবল্য উপস্থিত হয়, মনুষ্যগণ সত্ত্ব পথ হইতে ভ্রষ্ট হইতে থাকে। কল্যাণকর বেদ মার্গ পরিত্যাগ করিয়া আসুরিক সিদ্ধি শক্তি ও বিভূতি লাভের জন্য তাহারা অশাস্ত্রবিহিত ঘোর তপস্যা ও অভিচারাদি ক্রিয়া দ্বারা দেবতাদের জীবোন্নতির কার্য্যে বাধা দেয়। তখনই দেবাসুর সংগ্রাম উপস্থিত হয়। এবং যে বিশিষ্ট মনুষ্যগণ জ্ঞান-যোগ, কর্ম্মযোগ, বা ভক্তিযোগ দ্বারা আসুরিক ও রাক্ষসিক প্রভাবের গতিকে বাধা দেন এবং অনুগত ব্যক্তিগণকে কল্যাণকর বৈদিক পথে প্রেরণ করেন, তাঁহারাই দেবতাগণের সাহায্য করেন। অতএব দেবাসুর মনুষ্যের সাধারণ সংগ্রামের ন্যায় কাটাকাটি মারামারি নহে এবং দেবতাগণ নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বা স্বর্গাদি রাজ্য রক্ষার জন্য বা অসুরদিগকে নাশ করিবার জন্য স্বর্গ হইতে দশরথাদিকে রথ পাঠাইয়া লইয়া যাইতেন না। এই কর্ম্মযোগী রাজা দশরথ ত্রিগুণান্বিত। যতক্ষণ জীবত্ব থাকে ততক্ষণ সকলেই ত্রিগুণান্বিত। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন :—

"ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভির্গুণৈঃ॥

গী ১৮।৪০

অর্থাৎ পৃথিবীতে ও এমন কি স্বর্গেও এমন কোনও জীব নাই যিনি প্রকৃতি জাত এই তিন (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ) গুণ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। সেই জন্য যেন রাজা দশরথের তিন মহিষী যৌবনে ও প্রৌঢ়াবস্থায় সত্ত্বগুণ অর্থাৎ কৌশল্যা নাম্নী মহিষী এবং সত্ত্বগুণাশ্রিত রজোগুণ অর্থাৎ সুমিত্রা নাম্নী মহিষী অবলম্বনে অর্থাৎ সাহচর্য্যে দেব কার্য্যে অর্থাৎ প্রজাগণের আধ্যাত্মিক উন্নতির কার্য্যে আত্ম নিয়োগ করিয়া এখন বৃদ্ধাবস্থায় শৈথিল্যবশতঃ তমোগুণের অর্থাৎ কৈকেয়ী নাম্নী মহিষীর বশবর্ত্তী হইয়াছেন। রাজ পুরোহিত বশিষ্টদেব বুঝিলেন, ভূভার হরণার্থ অর্থাৎ মানবের কল্যাণের জন্য ভগবানকে দশরথের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইতে হইবে। কিন্তু রাজা তমোগুণাশ্রয়ে অনেকটা পতিত। তিনি দশরথকে যোগে পুনঃ প্রবৃত্ত করিবার জন্য তপোবন হইতে বিভাণ্ডক মুনিপুত্র পরম বৈরাগ্যবান্ ঋষ্যশৃঙ্গকে আনাইলেন। এই ঋষ্যশৃঙ্গ একেবারে ভগবদ্ভাবে তন্ময়। বাহ্যজ্ঞান তাঁহার প্রায় থাকিত না। স্ত্রী-পুরুষের ভেদজ্ঞান তাহার ছিল না। তিনি অযোধ্যায় আসিয়া রাজা দশরথকে যজ্ঞে দীক্ষিত করিলেন। অর্থাৎ সুপবিত্র কর্ম্মযোগ করাইতে লাগিলেন। এবং জীবের হিতার্থ সুপুত্র উৎপাদনের জন্য পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিলেন। এই যজ্ঞের সুপবিত্র চরুতে ভগবান বীজরূপে আবির্ভূত হইলেন। ঋষির একান্ত ইচ্ছা ছিল যে কৌশল্যাকেই ঐ চরু ভক্ষণ করাইবেন। কারণ পূর্ণ সত্ত্বগুণে ভগবানের আবির্ভাব তাঁহার বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় কৈকেয়ী তাহাতে ভাগ বসাইলেন। দুই জনে ভাগ করিয়া খাইবেন, এমন সময়ে সুমিত্রা আসিয়া উভয়ের নিকট কাতর

প্রার্থনা জানাইলেন। ও তাঁহারা নিজ নিজ ভাগের কিছু সুমিত্রাকে দিলেন। এই চরু দ্বারা তাহাদের গর্ভ সঞ্চার হইল। তাঁহারা যথাসময়ে চারিপুত্র প্রসব করিলেন। কৌশল্যার গর্ভে বা সত্ত্বগুণে রাম, কৈকেয়ীর গর্ভে বা তমোগুণে ভরত, সুমিত্রার গর্ভে যমজ পুত্রদ্বয় লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন অর্থাৎ কৌশল্যাদত্ত চরুর তেজে সত্ত্বগুণাশ্রিত রজোগুণে লক্ষণ ও কৈকেয়ীদত্ত চরুর তেজে তমোগুণাশ্রিত রজোগুণে শত্রুঘ্ন। সত্ত্বগুণের মূর্ত্তি রাম ব্রাহ্মণ স্বভাবাপন্ন। সত্ত্বগুণাশ্রিত রজোগুণে লক্ষ্মণ ক্ষত্রিয় ভাবযুক্ত। তমোগুণাশ্রিত রজোগুণে শত্রুঘ্ন বৈশ্যভাবসম্পন্ন এবং তমোগুণে সম্ভূত ভরত শূদ্র ভাবান্বিত। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা লইয়াই রামায়ণ। ভরত রামের প্রতি ভক্তিভরে কিছুদিন তাঁহার আদেশে রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। শত্রুঘ্ন কখনও কখনও আসুরিক শক্তি নাশের জন্য রামের আদেশে কার্য্য করিতেন। ইহাদের দুইজনের বিশেষ কোনও কার্য্যের আবশ্যকতা হয় নাই। এবং তাঁহাদের উন্নত শিক্ষার ব্যবস্থা রামায়ণে বর্ণিত হয় নাই। তাঁহারা রাম ও সীতার বিশেষ ভক্ত ছিলেন।

রাম ও লক্ষ্মণের শিক্ষা

গুরু বশিষ্ঠ দেব রাজার কর্ত্তব্য পালন জন্য যে সৎশিক্ষা দেওয়া আবশ্যক, তাহা রাম ও লক্ষ্মণকে ক্রমে দিতে লাগিলেন। সংসারে সচ্চরিত্র ভাবে অবস্থান, বিলাসিতা বর্জ্জন, নিত্যনৈমিত্তিক পূজা

যাগ যজ্ঞাদি সম্পাদন, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, রাজনীতি, গৃহস্থনীতি ইত্যাদি যথা নিয়মে তিনি বালকদ্বয়কে শিখাইলেন। তিনি জানিতেন, রাম ভগবানের অবতার। ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্তির দ্বারা কিরূপে জীবের যাতায়াত নিবৃত্ত হয়, তাহা আপনি আচরণ করিয়া মানুষকে শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার জন্ম। সেইজন্য তিনি মহাতেজা বিশ্বামিত্র ঋষিকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে রাম ও লক্ষ্মণের শিক্ষার ভার লইতে অনুরোধ করিলেন। রাজা দশরথ ইহাতে একান্ত অসম্মত। তিনি বিশ্বামিত্রের হস্তে রাম লক্ষ্মণের শিক্ষার ভার দিবার সম্পূর্ণ বিরোধী। তাঁহার বড় আদরের পুত্র রাম সংসারের নানা ভোগে সর্বদা সুখ লাভ করেন, এই তাঁহার ইচ্ছা। কঠিন ত্যাগ-বৈরাগ্য-ব্রতচারী বিশ্বামিত্রকে তিনি বড় ভয় করিতেন। কিন্তু তাঁহার অনিচ্ছা ও বিরুদ্ধাচরণে কোন ফল হইল না। বশিষ্টের কঠিন আজ্ঞা ও ভগবদিচ্ছা বলবতী হইল। বিশ্বামিত্র বালকদ্বয়ের শিক্ষার ভার লইলেন। তিনি অযোধ্যায় থাকিয়া নিয়মিত ভাবে রাম লক্ষ্মণের উন্নতির জন্য আত্মনিয়োগ করিলেন। এখন বিশ্বামিত্র ঋষি সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। ইনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে কঠিন তপস্যা দ্বারা যোগী-পদ প্রাপ্ত হন। পূর্ব্ব-জন্মে দেহত্যাগ কালে মনে ভোগ বাসনা উদিত হওয়ায় যোগভ্রষ্ট হন। এবং সেইজন্য তাহাকে স্বর্গে বহুকাল নানাবিধ ইন্দ্রিয় ভোগে রত থাকিতে হয়। সেখানে তাঁহার ভোগের প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা উৎপাদন করিয়া ভগবান তাঁহার যোগপথ পুণঃ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে পবিত্র চরিত্র ধনী কুশিক বংশ জাত গাধি রাজার পুত্ররূপে প্রেরণ করেন। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে অর্জ্জুন প্রশ্ন করিয়াছিলেন :—

"অযতি শ্রদ্ধয়োপেতঃ যোগাচ্চলিত মানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি।।
কচ্চিন্নোভয় বিভ্রষ্ট শ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি।।

গী ৬-৩৭—৩৮

হে কৃষ্ণ! শ্রদ্ধাবান সাধক ইন্দ্রিয় ও মন সংযত করিতে অসমর্থ হইয়া যোগভ্রষ্ট হইলে যোগীর প্রাপ্য পরম পদ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কোন গতি লাভ করিবে? তিনি সকাম পূণ্য কর্ম অনুষ্ঠান করেন নাই সেই জন্য স্বর্গে যাইতে পারিবেন না। এবং তিনি নির্গুণ বা সগুন ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি রূপ যোগ ফল হইতে বঞ্চিত হইলেন। তবে তিনি ব্রহ্মলোক ও স্বর্গলোক উভয়স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ছিন্ন মেঘের ন্যায় কোনও স্থানে আশ্রয় না পাইয়া মোহগ্রস্থ ভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাকিবেন। ভগবান উত্তরে বলিলেন ঃ—

'পার্থঃ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
নহি কল্যাণ কৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।।
প্রাপ্য পুণ্য কৃতাং লোকান্ উষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোহভি জায়তে।।

গী ৬-৪০—৪১

হে অর্জুন! মোক্ষলাভেচ্ছু কল্যাণকারী সাধক পৃথিবীতে বা স্বর্গে কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হন না। মনে ভোগের আকাঙ্ক্ষার

জাগরণের জন্য যোগ ভ্রংশ ঘটিলে সেই সমগ্র ভোগ্য বস্তু বিশেষ ভাবে ভোগ করিয়া তাহাতে বিতৃষ্ণা আনিবার জন্য ভগবন্নিয়ম অনুসারে তাঁহাকে স্বর্গে যাইতে হয়। সেখানে বহুকাল ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করিয়া তাঁহার সাধন পথে পুণঃ উন্নতির জন্য তাঁহাকে পবিত্র চরিত্র ধনী ব্যক্তির বংশে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। ধনী ও পবিত্র চরিত্র দুই বলিবার কারণ যাঁহার যোগ ও ভোগ উভয়ই আছে। স্বর্গ হইতে প্রত্যাগত যোগভ্রষ্ট সাধক এখনও ভোগে কিঞ্চিৎ আসক্ত আছেন। অথচ যোগে উন্নীত হইবার জন্য বাল্য-কাল হইতে সৎশিক্ষা ও ভগবদ্ভক্তি, পিতামাতা ও আত্মীয়গণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক. কাজেই এইরূপ স্থানেই ঐ সাধকের যোগ মার্গে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর। আর যে সাধকের ভোগাকাঙ্ক্ষা উদয় হয় নাই, কিন্তু যোগ সমাপ্তির পূর্বে দেহ ত্যাগ হইয়াছে বা যে সাধক শিথিল প্রযত্নতাজন্য শেষে যোগ-মার্গে অবহেলা করিয়াছেন। তাহাদিগকে ভোগ বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য স্বর্গে যাইতে হয় না। পৃথিবীতে আসিয়া যোগি-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। যথা গীতা :—

"অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাং।
এতদ্ধি দুর্লভ তরং লোকে জন্ম যদীদৃশম ॥

গী ৬-৪২

বিশ্বামিত্র ঋষি প্রথমোক্ত যোগভ্রষ্ট সাধক, সেইজন্য তিনি স্বর্গ ভোগান্তে পবিত্র চরিত্র ধনী ব্যক্তির গৃহে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। তিনি যৌবনকাল পর্য্যন্ত নানা ভোগ সুখে অতিবাহিত করেন।

ঠিক উপযুক্ত সময় হইয়াছে দেখিয়া ভগবান একদিন তাঁহাকে বশিষ্টের ব্রহ্মতেজ দর্শন করাইলেন। অমনি তাঁহার পূর্বজন্মের শুভ সংস্কারের পুনরুদয় হইল। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন ঃ—

পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবসোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দ ব্রহ্মাতি বর্ত্ততে ॥
প্রযত্নাদ যত মানস্তু যোগী সংশুদ্ধ কিল্বিষঃ।
অনেক জন্ম সংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিং ॥

গী ৬-৪৪-৪৫

অর্থাৎ পূর্ব জন্মের অভ্যাস বশতঃ তিনি সাধন মার্গে অবশ ভাবে আকৃষ্ট হন। এবং পূর্বজন্মে ভগবৎ সম্বন্ধে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া থাকিলে এ জন্মে আর তাঁহার স্বর্গ প্রাপ্তি ফলক সকাম কর্ম মার্গে প্রবেশ করিতে হয় না। উত্তরোত্তর অধিকতর পরিশ্রম ও উৎসাহ সহকারে সাধন করিতে করিতে সমস্ত পাপ পুণ্য ক্ষয় হইয়া গেলে, সাধনের কঠোরতার তারতম্যানুসারে দুই বা ততোধিক জন্মে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। বশিষ্ঠের ব্রহ্মতেজ দর্শনে পূর্ব সংস্কার জাগরিত হওয়ায়, তিনি রাজ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া কঠিন তপস্যা দ্বারা সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হইবার ইচ্ছা করিলেন। সাধন চতুষ্টয় কাহাকে কহে তাঁহার আলোচনা আবশ্যক। গীতোক্ত কর্মযোগ সাধনের পরিপক্কতাবস্থায় অন্তঃকরণে নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক. ইহামুত্রভোগবিরাগ, শম-দমাদি সাধন সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব, এই চারিটি অবস্থা উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে প্রথম নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক অর্থাৎ ব্রহ্মই একমাত্র নিত্য,

তদ্ব্যতীত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থই অনিত্য বা ক্ষণভঙ্গুর, এই পার্থক্য উপলব্ধি। দ্বিতীয়—ইহামুত্রভোগবিরাগ অর্থাৎ পৃথিবীতে ও স্বর্গে যত প্রকার ভোগ আছে, তাহাতে সম্পূর্ণ অনাসক্তি এবং সেগুলি অতি তুচ্ছ বলিয়া উপলব্ধি। তৃতীয়—শমদমাদি সাধন সম্পৎ—অর্থাৎ শম,-দম,-তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা ও সমাধান রূপ সম্পত্তি লাভ। মনকে সমস্ত ভোগ্য পদার্থ হইতে উৎপন্ন সুখ চিন্তা হইতে বিরত করার নাম শম, ইন্দ্রিয়গণকে পূর্ণভাবে দমন করার নাম দম। শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি সহ্য করার নাম তিতিক্ষা। সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগের নাম উপরতি। গুরু ও বেদান্ত বাক্যে পূর্ণ বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। মনকে ও ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহৃত করিয়া ধ্যেয় পদার্থে একাগ্র করার নাম সমাধান। চতুর্থ—মুক্তি পাইবার জন্য তীব্র ইচ্ছার নাম মুমুক্ষুত্ব। বিশ্বামিত্র এই অবস্থাগুলি লাভ করিবার জন্য প্রাণপণে কঠিন পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। ভগবৎ পথে ও ব্রহ্ম পথে গমনেচ্ছু মানবকে দেবগণ সর্বদাই সাহায্য করেন। পূর্বে উক্ত হইয়াছে দেবতাদের ইহাই কার্য্য।

এই বিশ্বামিত্রের হৃদয়ে এখনও কাম ক্রোধ বিনষ্ট না হওয়ায় তাঁহারা যাহাতে এই বৃত্তিগুলি তাঁহার মন হইতে সম্পূর্ণভাবে অপসৃত হয় এবং যাহাতে অচঞ্চল মন তাঁহার বুদ্ধির শুদ্ধি সম্পাদনে সমর্থ হয়, সেইজন্য মেনকা নাম্নী এক পরমা সুন্দরী যুবতী দ্বারা তাঁহার চিত্তস্থৈর্য্য নষ্ট করিলেন। মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র অচিরে তাহার অধঃপতন বুঝিতে পারিলেন। এবং তীব্র যোগের সাহায্যে ভগবদ্ভাব দ্বারা মনের কামভাব বিদূরিত করিতে সমর্থ হইলেন। কিছুদিন পরে দেবগণ রম্ভা নামে আর একটি স্ত্রীলোককে তাঁহার

নিকট প্রেরণ করেন। তাহাতে তিনি ক্রোধাবিষ্ট হন। এই ক্রোধের আবেশে আবার তাহাকে পতিত হইতে হইল। কিন্তু মহাতেজা তপস্বী অচিরেই এই দৌর্বল্য জয় করিতে সমর্থ হন। ইন্দ্রিয় বর্গ সম্যক্ পরিশুদ্ধ করিয়া মনকে বুদ্ধির অধীনে করতঃ পরম-পদ চিন্তা করিতে করিতে তিনি অচিরে সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হন। এবং বেদান্ত শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা ব্রহ্ম বিদ্যালাভের জন্য অগ্রসর হন। এই সময় বশিষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণের কর্ম্মযোগ শিক্ষার ভার তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন।

বশিষ্ঠ নিজেই উহা করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি মনে করিলেন বিশ্বামিত্র এই জন্মেই বিষয়বাসনা ও কাম ক্রোধাদির সহিত সংগ্রামে যেরূপ অপরূপ কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন, এবং ঐ সাধনে তাঁহাকে যে সমস্ত প্রণালী ও সাধন পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হইয়াছে, সেইগুলি রামের জানা আবশ্যক। সেইগুলি তাঁহার মন্ত্র সহিত অস্ত্ররূপে রামায়ণে বর্ণিত আছে। বিশ্বামিত্রঋষি রামের সহিত লক্ষ্মণকেও লইলেন। কারণ সত্ত্বগুণ একা কোন কার্য্য করিতে পারে না। যতক্ষণ জীবের সত্তাশ্রিত রজোগুণ থাকে ততক্ষণ জীব-হিতার্থ কর্ম্ম সংসারে ভগবন্নির্দিষ্ট কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকে। শুদ্ধ সত্ত্বে সাধক আত্মতৃপ্ত আত্মরতি ও আত্মসন্তুষ্ট অবস্থায় উন্নীত হইয়া সত্ত্বগুণকেও পরিত্যাগ করিয়া ত্রিগুণাতীত হইয়া যান। বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে গীতোক্ত কর্মযোগ শিখাইতে লাগিলেন। ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া "আমি কর্ম্ম করিতেছি" এই অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া স্বধর্মাচরণ অর্থাৎ রাজ্য শাসন, প্রজা পালন, যাগ যজ্ঞাদি সম্পাদন, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি রাজ-

কর্ত্তব্যগুলি নির্ম্মলভাবে আচরণ ও সর্বদা ভগবচ্চিত্ত হইয়া কর্ত্তৃত্ব ইন্দ্রিয় ও মনের উপর নিক্ষেপ করিয়া আত্মস্থভাবে অবস্থান অভ্যাস করাইতে লাগিলেন। পুরুষোত্তম লীলা বিগ্রহধারী ত্রেতা-যুগাবতার রামকে এই সমস্ত শিক্ষা করিতে বেশীদিন লাগিল না। সাধারণ জীবের পূর্ব জন্মের সংস্কার এই সমস্ত সাধনে প্রবল বাধা উপস্থিত করে, তাঁহার সে সমস্ত সংস্কার নাই। এই সময় বিশ্বামিত্র ঋষি তাঁহাদের দ্বারা লোকের ভগবন্মার্গে যাইবার কয়েকটি বাধা দূর করিয়া জীবের অশেষ উপকার করিলেন।

তাড়কা উদ্ধার

রাবণ রাজার আসুরিক শক্তিসিদ্ধির প্রভাব সমগ্র ভারতে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্য অনেক ছিল। তাঁহারা সর্বত্র গৃহস্থ সংসারীদিগকে ও এমন কি বনসাসী তপস্বী-দিগকেও নিজ নিজ সিদ্ধি দেখাইয়া মুগ্ধ করিয়া আসুরিক সাধন পদ্ধতির উপদেশ দিতে ছিল এবং যেখানে বেদবিহিত যজ্ঞাদির ও কর্মযোগের অনুষ্ঠান দেখিত, সেইখানে নিজেদের মায়াজাল বিস্তৃত করিয়া নানা কৌশলে ঐ সমস্ত যাগ যজ্ঞকর্মাদি ও সাধন ভজন পণ্ড করিয়া দিত এবং নিজেদের বিভূতি ও সিদ্ধি প্রদর্শন করিয়া নিরীহ জনগণকে আসুরিক সিদ্ধি ও শক্তিলাভ করিবার জন্য উৎসাহিত করিত। তাড়কা, খর এবং দূষণ অযোধ্যার সন্নিহিত স্থানে আবাস-স্থান স্থির করিয়া তত্রত্য প্রজাদের এইরূপে সর্বনাশ সাধন করিতেছিল। বিশ্বামিত্র রাম লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া ঐ ঐ স্থানে গিয়া বেদবিহিত যজ্ঞাদির ও কর্মযোগের অপূর্ব মহিমা কীর্তন করিতে

লাগিলেন। রাম-লক্ষ্মণ বেদ ও অন্যান্য সৎশাস্ত্রের সুন্দর ব্যাখ্যা দ্বারা শক্তি, সিদ্ধি ও বিভূতি লাভ যে অতি তুচ্ছ, ভগবদ্ভক্তি এবং ব্রহ্মত্বলাভই মানুষের পরম উপাদেয় তাহা সাধারণকে বুঝাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের দেব-চরিত্রের মাধুর্য্য দর্শন করিয়া ও তাঁহাদের অকপট ব্যবহারে আকৃষ্ট হইয়া অনেকে তাঁহাদের নিকট আসিয়া উপদেশ শুনিতে লাগিল,—রামলক্ষ্মণের সরল ও আনন্দময় ভগবদ্ভাব, তাঁহাদের নিষ্কাম জনহিতকর কার্য্য, তাঁহাদের নিরহঙ্কার ভাব ও বিনয়পূর্ণ বার্ত্তালাপে তত্রত্য জনগণ আসুরিক সাধনা পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। এমন কি তাড়কানাম্নী রাবণের প্রবল আসুরিক শক্তিশালিনী শিষ্যাও তাঁহাদের মধুর কার্য্যাবলী দেখিয়া ও উপাদেয় বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবৎ পথে আরূঢ় হইতে আগ্রহান্বিত হইলেন এবং রামের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া আনন্দ প্রাপ্তির পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। খর ও দূষণ তাড়কার এই আচরণে অত্যন্ত রুষ্ট হইল এবং নানারূপে তাড়কা ও তত্রত্য জনগণকে রামলক্ষ্মণের বিরুদ্ধাচরণের জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিল। কিছুতেই কৃতকার্য্য না হইয়া তাহারা তাহাদের অনুগত আসুরিকবৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণকে লইয়া জনস্থানে তাহাদের গুরু সূর্পনখার নিকট প্রস্থান করিল। দেশে পুনরায় বৈদিক ধর্ম্মের ও কর্ম্মযোগের স্রোত ফিরিয়া আসিল। অনেকেই বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। রামলক্ষ্মণকে লইয়া বিশ্বামিত্র পুনরায় অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহাদের কর্ম্মযোগ সাধনা প্রায় পূর্ণাঙ্গ হইয়া আসিতে লাগিল। দৈবী সম্পত্তিগুলি তাঁহাদের কার্য্যে সুন্দররূপে প্রকাশ হইতে লাগিল।

অহল্যা উদ্ধার

অযোধ্যার সন্নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে ন্যায়শাস্ত্র প্রণেতা গৌতম ঋষি শিষ্যগণকে শাস্ত্রাধ্যাপন করিতেন। তাঁহার পত্নীর নাম অহল্যা। সেই সময় রাবণ রাজার শিষ্যদিগের আসুরিক ধর্ম-প্রচারে বেদবিহিত সাধনমার্গের ও পবিত্রতার অনেকটা অপলাপ হইয়াছিল। দেশে সর্বত্র পাপের স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। ঋষির আশ্রমেও অজ্ঞাতসারে তাহা প্রবেশ করিল। অহল্যা ঋষি-পত্নী হইয়াও মনে মনে তাঁহার স্বামীর এক শিষ্যের প্রতি আসক্তা হইলেন। শিষ্যের মনও কলুষিত হইল। এই শিষ্য দেবরাজ ইন্দ্র বলিয়া রামায়ণে বর্ণিত আছে। এবং ইহাও বর্ণিত আছে যে, গৌতম ঋষি তপঃপ্রভাবে ইন্দ্রের অপকার্য্য জানিতে পারিয়া তাঁহাকে দারুণ অভিশাপ দেন। তাঁহার সর্বাঙ্গে সহস্র ভগচিহ্ন প্রকাশ পায়। পরে কঠিন তপস্যার দ্বারা তিনি ঐ ভগচিহ্নগুলিকে চক্ষুতে পরিবর্তিত করেন—সেইজন্য তাঁহার নাম হয় সহস্রলোচন। কাব্য হিসাবে এইরূপ বর্ণনা সমাজের হিতার্থ হইতে পারে কিন্তু রামায়ণ প্রণেতা মহর্ষি ভালরূপেই জানিতেন যে, দেবরাজ ইন্দ্র দূরে থাক্, কোন দেবতাই দুষ্ক্রিয়াসক্ত হইতে পারেন না। এখন দেবতাদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আবশ্যক। সাধারণ লোকে নিজের চরিত্রের ও কার্য্যের অনুপাতে ও মাপকাঠিতে মাপিয়া দেবতাদিগকে লম্পট, খোসামোদপ্রিয়, ঘুসখোর, স্বার্থপর ইত্যাদি মনে করে ও বর্ণনা করে। ইহা মানুষের স্বাভাবিক। এইরূপ ধারণা ব্যতিত সাধারণ অজ্ঞ মানব বাঁচিতেই পারে না। এবং পুরাণাদিতে ঐ সমস্ত

মানবের শিক্ষা ও উন্নতির জন্য দেবতাদের ঐরূপ বর্ণনা ঋষিরাই করিয়াছেন। গীতা বা উপনিষদাদিতে যেরূপ উন্নতভাবযুক্ত দেবতার বর্ণনা আছে, তাহা সাধারণের ধারণার যোগ্য হয় না এবং সেরূপ দেবতার নিকট অগ্রসর হইতে বা তাঁহাদিগের পূজা ও সাধন করিতে সাধারণের কোনও প্রবৃত্তিই হয় না। ঐ সমস্ত দেবতা তাহাদের গণ্ডীর বাহিরে। শাস্ত্রাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়, ভূর্লোক অর্থাৎ মনুষ্যলোক হইতে উর্দ্ধতন ছয়টী লোকে দেবগণ বাস করেন। তন্মধ্যে প্রথম ভুবর্লোকে "পিতৃ" নামক এক শ্রেণীর দেবতা বাস করেন। তাঁহাদের তথার আয়ুষ্কাল মনুষ্য পরিমাণে তিন সহস্র বৎসর, অর্থাৎ আমাদের একমাসে তাঁহাদের একদিন হয়। এই ভুবর্লোকে বিদ্যাধর, অপ্সর, যক্ষ, রক্ষঃ, গন্ধর্ব, কিন্নর, পিশাচ, গুহ্যক, সিদ্ধ ও ভূতগণও বাস করেন। ইঁহারাও নিম্নশ্রেণীর দেবযোনি বিশেষ। পূর্বে উক্ত হইয়াছে, পৃথিবীতে ভগবদ্বিহীন সকাম তামসিক ও রাজসিক তপস্যার দ্বারা মানবগণ এই লোকে আসিতে পারেন।

তদূর্দ্ধলোক স্বর্লোক, স্বর্গলোক বা সুরেন্দ্রলোক। এখানে দুই শ্রেণীর দেবতা বাস করেন। প্রথম শ্রেণী আজান দেবতা অর্থাৎ ইঁহারা ব্রহ্মার কল্পারম্ভে অর্থাৎ খণ্ড প্রলয়রূপ ব্রহ্মার নিশান্তের পরই তৎকর্তৃক ত্রিভুবন পালন জন্য সৃষ্ট হন। ইঁহারা এক কল্প অর্থাৎ মনুষ্য পরিমাণের চারিশত বত্রিশ কোটী বৎসর জীবিত থাকিয়া ত্রিভুবন পালনে ব্রহ্মার সাহায্য করেন এবং ব্রহ্মার সন্ধ্যায় অর্থাৎ কল্পান্তে স্ব-স্ব কর্মোচিত ধামে অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থিত যে কোনও লোকে গমন করেন কিংবা কেহ বা নির্জ্জন বা পরামুক্তিরও অধিকারী হন। ইঁহারাই মানবের পূজনীয় দেবতা। ইঁহারাই সর্বদা মানবের

কল্যাণ পথের সাহায্যকারী। ইঁহাদিগকে অনুকরণ করাই মানবের পুরুষার্থ। যাঁহারা দৈব প্রকৃতি বলিয়া খ্যাত তাঁহারা এই দেবগণকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেন। দৈব প্রকৃতি সম্বন্ধে গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। যথা ঃ—

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগ ব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবং॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেম্বলোলুপ্ত্বং মার্দবং হ্রীরচাপলম্॥
তেজঃ ক্ষমাধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমতিজাতস্য ভারত॥

গী ১৬।১—৩

অর্থাৎ দেবপ্রকৃতি সম্পন্ন মানবের এই কয়টী গুণ থাকে। যথা ঃ—অভয়, সত্ত্বসংশুদ্ধি, জ্ঞানযোগে বিশেষরূপে অবস্থান, দান (সাত্ত্বিক), দম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্য, ক্রোধরাহিত্য, ত্যাগ, শান্তি, পৈশুন্যরাহিত্য, জীবে দয়া, অলোলুপত্ব, মৃদুতা, স্বপ্রশংসাশ্রবণে লজ্জা, চাপল্যরাহিত্য, তেজ, ক্ষমা ধৃতি (সাত্ত্বিক), বাহ্য ও আভ্যন্তর পবিত্রতা, অদ্রোহ ও অনতিমানিত্ব। যে মানব এই আজান দেবগণের ভক্ত বা অনুকরণকারী, তাহাদের যদি এই সমস্ত গুণ থাকা আবশ্যক, তাহা হইলে সেই দেবতাগণের যে এই সমস্ত গুণ পূর্ণমাত্রায় আছে, তাহা গীতাধ্যায়ীর সহজবোধ্য। এই দেবগণের শ্রেষ্ঠ দেবতা ইন্দ্র। তিনি নিরন্তর অতন্দ্রিতভাবে

এবং নিষ্কামভাবে ত্রিভুবনের উন্নতির জন্য কর্ম করিয়া যাইতেছেন। কাম ক্রোধাদির সংস্পর্শ তাঁহার অন্তঃকরণে স্থান পাইতে পারে না। তিনি সহস্রলোচন নামে খ্যাত। যথার্থ তাঁহার দেহে সহস্রটি চক্ষুঃ নাই। বেদে পুরুষসূক্তে পরমপুরুষকে সহস্রাক্ষ বলিয়াছেন। যথা :—

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং সর্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং॥

অর্থাৎ পরমপুরুষ (ভগবান্) সহস্র মস্তক বিশিষ্ট, সহস্রলোচন-বিশিষ্ট ও সহস্র পদবিশিষ্ট। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করিয়া তদূর্দ্ধেও বিরাজমান আছেন।

গীতারও সগুণ ও নির্গুণ মহিমায় মণ্ডিত পরব্রহ্মকে সর্বতঃ অক্ষিমান্ বলিয়া বর্ণনা আছে। যথা :—

সর্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখং।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥

গী ১৩।১৪

অর্থাৎ ব্রহ্মার সর্বদিকেই হস্ত ও পদ, সর্বদিকেই চক্ষুঃ, মস্তক ও মুখ, সর্বদিকেই কর্ণ এবং তিনি সকল আবৃত করিয়া বিরাজ করিতেছেন। ইন্দ্র দেবগণের রাজা। সেইজন্য তাঁহার সর্বজ্ঞত্ব অবশ্যই বর্ত্তমান আছে। তজ্জন্যই তাঁহাকে সহস্রলোচন বলা হয়। এইরূপ দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র কামী, ইহা কল্পনায় আনাও জীবের মহা-

পাপ। স্বর্গে আর এক শ্রেণীর দেবতা আছেন, তাঁহাদিগকে কর্ম-দেবতা বলে। মনুষ্যগণ পৃথিবীতে সকামপুণ্য কর্ম করিয়া তাঁহার ফলস্বরূপ ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ জন্য স্বর্গে গমন করেন। তথায় তাঁহারা উক্ত আজান দেবতাগণের স্ত্রী, পুত্র, পশু বা ভৃত্যভাবে স্বীয় পুণ্যোচিত ভোগ প্রাপ্ত হইয়া ৩৬ হাজার বর্ষ পর্য্যন্ত বাস করিতে পারেন, তৎপরে আবার পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন ঃ—

ত্রৈবিদ্যাঃ মাং সোমপাঃ পূতপাপাঃ
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্য মাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকং
অশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশান্তি।
এবং ত্রয়ী ধর্ম মনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামালভন্তে ॥

গী ৯।২০-২১—

অর্থাৎ কর্মকাণ্ডে পণ্ডিতগণ সোমপান করিয়া মালিন্য ক্ষলিত করিয়া যজ্ঞের দ্বারা ভগবানের পূজা করিয়া স্বর্গগমন প্রার্থনা করেন। তাঁহারা পবিত্র সুরেন্দ্রলোক (স্বর্গলোক) প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে দেবভোগ্য পদার্থ ভোগ করেন। তাঁহারা বিশাল স্বর্গলোকের অনন্তভোগ্য বস্তু উপভোগ করিয়া নিজ নিজ পুণ্যের ক্ষয়ে পুনরায়

মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করেন। এইরূপ বেদের কর্মকাণ্ডাশ্রয়ী কামনা-পরায়ণ ব্যক্তিগণ কেবল যাতায়াত করিতে থাকেন। এই কর্ম-দেবতাগণ স্বর্গে কেবল ভোগসুখের জন্য গমন করেন। তথায় তাঁহাদের সাধন-ভজন ও পাপ-পুণ্যফলক কোন কর্মই নাই, কিন্তু আজান দেবতাগণ সর্বদা ভগবৎ সাধনে রত। গীতায় তৃতীয় অধ্যায়ে এই আজান দেবতাগণ সর্বদা মনুষ্যের হিতে রত বলিয়া বর্ণিত আছে। যথা :—

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্ত বঃ।
পরস্পরং ভাবয়বন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমাবাপ্স্যথ ॥
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞ ভাবিতাঃ।
তৈর্দ্দত্তান অপ্রদায়েভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ ॥

গী ৩।১১-১২—

অর্থাৎ যজ্ঞ (স্বকর্ত্তব্যপালন) দ্বারা দেবতাগণের পূজা করা এবং সেই দেবগণও তোমাদের প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করুন। এই পরস্পর সাহায্য করিতে করিতে পরামুক্তি লাভ করিবে। যজ্ঞের দ্বারা পূজিত হইয়া দেবগণ তোমাদের অভিলষিত ভোগ্য পদার্থ দান করিবেন। তাঁহাদের দত্ত পদার্থগুলি যাহাদের জন্য তাঁহারা প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে না দিয়া নিজে আত্মসাৎ করিলে তোমরা চোর বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। মানবগণ সর্বদা শুদ্ধচিত্ত, নিরহঙ্কার, পরোপকারী ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হইলেই দেবতাগণ আনন্দিত হন। তাঁহাদের প্রশংসা করিয়া বা তাঁহাদিগকে ভোগ্য পদার্থ দান করিয়া সন্তুষ্ট করিয়া অন্যায়ভাবে কোন অভীষ্ট সংগ্রহে ইচ্ছুক

ব্যক্তিকে তাঁহারা দণ্ডিত করেন। যদি পৃথিবীর কোন জেলায় রাজকর্মচারী অন্যায়ভাবে প্রজাপীড়ন করেন বা তোষামোদের দ্বারা বাধ্য হইয়া বা উৎকোচ গ্রহণ করিয়া একজনের ক্ষতিসাধন করতঃ অন্যের স্বার্থসিদ্ধি করিয়া দেন, তাঁহাকে কি কেহ প্রশংসা করে? তাঁহার নিয়োগকর্ত্তা রাজা হয়ত তাঁহার ঐ দোষ দেখিতে পাইতে না পারেন, কারণ রাজা মনুষ্য মাত্র, কিন্তু দেবগণের নিযোক্তা ভগবান্ ব্রহ্মা ত মানুষ নহেন এবং তিনি গাঁজা খাইয়া মত্তও থাকেন না। তিনি সর্বজ্ঞ, তিনি কিরূপে ঐরূপ ঘৃণিত চরিত্রের অকালকুষ্মাণ্ডকে ত্রিভুবন পালনের ভার দিবেন? তৎপরে আজান দেবতাই হউন বা কর্মদেবতাই হউন, তাঁহাদের দেহ তৈজসপ্রধান অর্থাৎ অগ্নিময় এবং আমাদের দেহ পার্থিব-প্রধান অর্থাৎ মৃন্ময়। এই দুই দেহের সংযোগ কখনও হয় না। অতএব গৌতমের এই শিষ্যটি মানুষ ছিলেন, দেবরাজ ইন্দ্র নহেন। গৌতমপত্নী অহল্যা আপনার অধঃপতনে দারুন অনুতাপগ্রস্ত হইলেন। ঋষি ক্রোধে তাঁহাকে অভিশাপ দেন নাই। তিনি তাঁহাকে অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্ত করিতে উপদেশ দিলেন। কারণ ঋষিগণ দেব প্রকৃতি সম্পন্ন। ক্রোধ তাঁহাদের নিকট আসিতেই পারে না। তাঁহারা মানুষের দৌর্বল্য চিকিৎসা করেন, দয়া প্রদর্শন করিয়া। অহল্যা নিদারুণ মনস্তাপে পাষাণবৎ স্তম্ভিত হইলেন। দেহের ধারণে ও পোষণে তাঁহার আস্থা রহিল না। সেই সময় বিশ্বামিত্র রামলক্ষ্মণকে লইয়া তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। রামের তেজোদীপ্ত দেবভাব-পূর্ণ সরল মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া অহল্যা যেন মৃতদেহে প্রাণ পাইলেন। তাঁহার চক্ষু অশ্রুভারে পূর্ণ হইল এবং রামকে ভগবান্

জ্ঞানে তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত অপরাধ তাঁহার চরণে নিবেদন করিলেন। রাম মধুর বচনে তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন এবং তাঁহাকে ভগবচ্চরণে আত্মবিসর্জন করিতে উপদেশ দিলেন। তাঁহার প্রদত্ত মন্ত্র ও সাধন প্রাপ্ত হইয়া অহল্যা ভোগবাসনা পরিত্যাগ করিয়া ভগবদ্ভজনে শীঘ্র পরমানন্দের সন্ধান পাইলেন এবং দ্রুত চিত্তশুদ্ধি করিতে লাগিলেন। গীতায় আছে—

অপি চেৎ সুদুরাচরো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতোহিসঃ ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি নমে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥
মাং হি পার্থ! ব্যপাশ্রিত্য যে ইপিস্যুঃ পাপযোনয়ঃ ॥
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রা স্তেহপি যান্তি পরাং গতিং ॥

গী ৯।৩০-৩২

অর্থাৎ অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তিও যদি একান্তভাবে আমাকে ভক্তি করিতে পারে তাহা হইলে তাহাকে সাধু বলিতে হইবে যেহেতু তাহার ভগবানে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি হইয়াছে। সে শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয় ও চিরশান্তিপ্রাপ্ত হয়। হে অর্জুন! জানিও ভগবানের একনিষ্ঠ ভক্ত কখনও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ হইতে ভ্রষ্ট হয় না। হে অর্জুন! স্ত্রীলোক হউক, বৈশ্য হউক, শূদ্র হউক, যদি আমাকে বিশেষরূপে আশ্রয় করে অর্থাৎ ভগবানে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে, তাহা হইলে সে পরমাগতি অর্থাৎ মুক্তিপ্রাপ্ত হয়।

অনন্যভাবে ভগবৎসাধনে অহল্যা স্বীয় পাপরাশি হইতে মুক্তি পাইলেন। শীঘ্রই তিনি ধর্মাত্মা বলিয়া পরিচিতা হইলেন এবং পূর্ণ শান্তির পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। স্ত্রীলোক ও পাপিণী হইয়াও উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করিয়া তিনি তত্রত্য জনগণের ও ঋষিগণের পরম সম্মানের স্থান অধিকার করিলেন ও তাঁহার দর্শনে কত পাপী ভগবৎপথে অগ্রসর হইবার সুযোগ পাইয়া আপনাদিগকে পাপমুক্ত করিতে লাগিল।

জনকরাজার সাধনা ও সিদ্ধিলাভ

জনকরাজা কর্মযোগ সুন্দররূপে আচরণ করিয়া সম্যক্ সিদ্ধি অর্থাৎ মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান বলিয়াছেন ঃ

"কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।"

অর্থাৎ কর্মযোগ দ্বারাই জনকাদি রাজগণ সম্যক্ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কর্মযোগ কিরূপে আচরণ করিতে হয় এবং কর্মযোগে সিদ্ধ হইয়া মানব কিরূপে সন্ন্যাসের অধিকারী হন এবং সন্ন্যাসী কিরূপে সাধন দ্বারা পরাভক্তি বা পূর্ণজ্ঞান পাইয়া নিজ পৃথক অস্তিত্ব লোপ করিয়া নির্গুণ ব্রহ্মে লীন কিংবা ঈশ্বর কোটির জীব হইয়া ভগবানের কার্য্যের সাহায্য করেন তাহা সংক্ষেপে ভগবান্ গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা ঃ—

"স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্ব কর্ম নিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃনু॥
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততং।
স্বকর্মণাতমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥
শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষং॥
সহজং কর্ম কৌন্তেয়! সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥
অসক্ত বুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি॥
সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয়! নিষ্ঠাজ্ঞানস্য যা পরা॥
বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়াযুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্যচ॥
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যত বাক্কায় মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহং।
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্ত ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি না কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং॥

ভক্ত্যামামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততোমাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরং ॥

গী ১৮।৪৫-৫৫

অর্থাৎ নিজ নিজ কর্মে সম্যক্ রত থাকিয়া মানব সম্যক্ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। স্বকর্মনিরত ব্যক্তি কিরূপে সিদ্ধি অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্ত হয় তাহা শ্রবণ কর [ইহার পূর্বে ভগবান্ ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের স্বাভাবিক ধর্ম বর্ণনা করিয়াছেন। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরে বর্ণাশ্রম ধর্ম সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইত, কিন্তু কলিতে এখন উহা আর সম্ভবপর নহে। গীতা সর্বকালের এবং সর্বদেশের শাস্ত্র। কলিকালে নিজ নিজ কর্ম বলিতে যিনি যে কাজ লইয়া আছেন তাহাই বুঝা উচিৎ। তাহা না হইলে গীতোক্ত সাধনে অধিকারী লোক একেবারে দুর্লভ হইবে] যাঁহা হইতে জীবের উৎপত্তি হইয়াছে এবং যাঁহার দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত রহিয়াছে, মানব তাঁহাকে স্বকর্ম দ্বারা অর্চনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করে। অপরের কর্ম নিজে সুন্দররূপে অনুষ্ঠান করিতে পারিব মনে হইলেও অপেক্ষাকৃত দোষযুক্ত নিজের কর্ম শ্রেয়ান্ অর্থাৎ করা কর্ত্তব্য। স্বভাবনিয়ত কর্ম করিলে পাপ হয় না। সহজাত অর্থাৎ স্বভাবনিয়ত কর্ম দোষযুক্ত হইলেও ত্যাগ করা উচিৎ নয়, কেননা যেমন সমস্ত অগ্নিতেই কিছু না কিছু ধূম থাকিবেই, সেইরূপ সমস্ত কর্মেই কিছু না কিছু দোষ আছেই। নিজ নিজ কর্ত্তব্য প্রত্যেক কর্ম, আমি নিজে করিতেছি এই আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয় ও মন সংযত করতঃ স্পৃহাশূন্য হইয়া করিলে সন্ন্যাস অবস্থা প্রাপ্তি হইয়া কর্ম আপনা হইতে চলিয়া যায় এবং কর্মযোগে সিদ্ধিলাভ হয়। এই

সিদ্ধি অর্থাৎ সন্ন্যাসাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কিরূপে ব্রহ্মলাভ হয়, এবং যাহা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ গন্তব্য বা প্রাপ্তব্য তাহা সংক্ষেপে আমার নিকট শ্রবণ কর।

(কর্মযোগ দ্বারা অর্জ্জিত) বিশেষরূপে শুদ্ধবুদ্ধিযুক্ত হইয়া ধৃতি (সাত্ত্বিক) দ্বারা মনকে বিশেষরূপে সংযত করিয়া ভোগ্যবস্তু পরিত্যাগপূর্বক আসক্তি ও বিরক্তি বিশেষরূপে জয় করিয়া, একান্তে (নির্জন ও পবিত্রদেশে) বাস করিয়া, লঘু ভোজন করিয়া বাক্য, দেহ ও মন সংযত রাখিয়া সর্বদা ধ্যানযোগযুক্ত হইয়া বৈরাগ্য সহকারে অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও সঞ্চয়ের ইচ্ছা বিশেষরূপে পরিত্যাগ করিয়া মমত্ব বর্জিত হইয়া নিস্তরঙ্গচিত্ত ব্যক্তি ব্রহ্মভাব-প্রাপ্ত হইবার যোগ্যতা প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির শোক বা আকাঙ্ক্ষা থাকে না। তিনি সর্বভূতে সমদর্শী হইয়া পরাভক্তি অর্থাৎ পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত হন। সেই পরাভক্তি বা পূর্ণজ্ঞান দ্বারা আমি কিরূপ মহান্ ও আমার যথার্থ স্বরূপ কি তাহা উপলব্ধি করিয়া তিনি তৎপরে নির্গুণ ব্রহ্মে প্রবেশ করেন অর্থাৎ নিজ পৃথক্ সত্তা বিলীন করিয়া ব্রহ্মে লীন হন।

কর্মযোগ করিতে করিতে তাহাতে সিদ্ধ হইয়া অর্থাৎ পূর্বোক্ত সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হইয়া সন্ন্যাস অর্থাৎ জ্ঞানভূমি লাভের অধিকারী হইয়া সাধক শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা ক্রমশঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করেন এবং ব্রহ্মানন্দ ভোগে মগ্ন থাকিয়া বাহিরের কর্ম আর করিতে পারেন না, কিন্তু যাঁহারা আরও উন্নত তাঁহারা যে ব্রহ্মানন্দ অনুভব করেন, সে আনন্দ মানুষকে বিতরণ করিবার জন্য তখনও কর্ম রাখেন। তখন তাঁহারা জীবন্মুক্ত, গুণাতীত, স্থিতপ্রজ্ঞ,

যোগারূঢ় ইত্যাদি আখ্যা প্রাপ্ত হন এবং সর্বভূতহিতে রত হইয়া ভগবানের কার্য্যের সহায়করূপে পৃথিবীতে বিচরণ করেন। তাঁহাদিগকে ঈশ্বর কোটীর জীব বলে।

জনকরাজা এইরূপ ঈশ্বর কোটীর জীব। তিনি ক্ষত্রিয়োচিত রাজ্যপালন, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন ইত্যাদি কার্য অনাসক্ত ও নিষ্কামভাবে সম্পাদন করিয়া চিত্তশুদ্ধিকরতঃ গৃহস্থ থাকিয়াই সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, এবং ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হইয়াছিলেন। সত্য ও ত্রেতাযুগে গৃহস্থগণও ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হইতেন, ইহা পরে আলোচনা করা হইবে। এই জনকরাজা বিদেহ নামে খ্যাত ছিলেন, অর্থাৎ তিনি স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ নামক তিন দেহ হইতে মুক্ত ছিলেন। ইঁহারা ইচ্ছা করিলে প্রারব্ধ শেষে স্থূলদেহের অবসানে স্বস্বরূপে লীন হইতেও পারেন, কিংবা ভগবানের কার্যে সাহায্য করিবার জন্য অবতারাদি হইয়া জগতে আবির্ভূত হইতে পারেন। ইহা তাঁহাদের বিলাস। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিয়াছেন, জীবকোটী লবণের পুতুলের ন্যায়। সাধন দ্বারা ব্রহ্মত্ব লাভ হইলে আর ফিরিয়া আসিতে পারে না, যেমন লবণের পুতুল সমুদ্র মাপিতে যাইয়া তাহাতেই নিজের পৃথক সত্তা হারাইয়া ফেলে। কিন্তু ঈশ্বরকোটীর জীব ব্রহ্মত্ব লাভের পরেও ফিরিতে সমর্থ থাকেন। জনকরাজা সীতার পালক পিতা, ইহা রামায়ণে বর্ণিত আছে। তাহাতে আছে, জনক-রাজা যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিতে করিতে লাঙ্গলের দ্বারা উৎখাত মৃত্তিকার মধ্যে সীতাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা রূপক। ইহার গুহ্য অর্থ এই যে সীতা অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা অযোনিসম্ভবা, অপৌরুষেয়া ও চিরস্থায়িনী। ইঁহার আদি ও অন্ত নাই। কাব্যের ভাষায় এইরূপ

সীতাপ্রাপ্তি সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জন করিতে পারে, কিন্তু রামায়ণের যথার্থ তথ্য অবগত হইতে হইলে সূক্ষ্ম দৃষ্টির সাহায্যে দেখিলে বুঝা যায় যে যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিতে হয় না, কারণ উহাতে ধান্য বা অন্য কোন শস্য উৎপাদন করিতে হয় না এবং তাহা হইলেও জনকরাজা ক্ষত্রিয় ও রাজা হইয়া স্বহস্তে ভূমি কর্ষণ করিতে যাইবেন কেন ? ইহার প্রকৃত অর্থ এই ঃ জনকরাজা সুন্দররূপে কর্মযোগ-সাধনরূপ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া ফলস্বরূপ ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন এবং শিবরূপী পরব্রহ্মা তাঁহাকে সযত্নে ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী সীতাকে কন্যার ন্যায় রক্ষা করিতে আদেশ দেন এবং উপযুক্ত অধিকারী পাইলে সবিশেষ পরীক্ষার পর তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী সীতাকে সম্প্রদান করিবার আদেশ দেন। রামায়ণের হরধনুতে জ্যা-রোপণই সেই কঠিন পরীক্ষা। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে কেহ সীতা পাইবেন না, এই জনকরাজার পণ। রূপকের যথার্থ অর্থ এই যে, যে সাধক সাধনচতুষ্টয় সম্পন্ন হইয়া শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন সহকারে শুভেচ্ছা, বিচারণা, তনুমানসা ও সত্তাপত্তি এই চারিটি জ্ঞানভূমি সাফল্যের সহিত উত্তীর্ণ হইবেন, তিনি এই ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী সীতাকে পাইবার অধিকারী হইবেন। এই ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী সীতাকে পাইবার আশায় কত ব্রাহ্মণ, কত রাজপুত্র জনকরাজার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেন। কিন্তু পরীক্ষা অতি কঠোর ছিল। সে পরীক্ষা পূর্বোল্লিখিত সাধনচতুষ্টয় সম্পন্ন হইয়া নিদিধ্যাসনের যোগ্যতালাভ। ইহাই হরধনুভঙ্গ। সে পরীক্ষায় কেহই উত্তীর্ণ হইলেন না। পরশুরাম বিখ্যাত তপস্বী ছিলেন। তিনি সাধারণ ঋষি অপেক্ষা অনেক শক্তি অর্জন করিয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি ভগবানের অবতার বলিয়া

বর্ণিত আছে। কিন্তু দর্প ও ক্রোধ জয় করিতে না পারায় তিনি বারবার পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। রাবণের ধারণা হইল, তিনি সাংখ্য ও পাতঞ্জল প্রোক্ত যোগসিদ্ধি লাভ করায় ব্রহ্মবিদ্যা-রূপিণী সীতাকে লাভ করিবার অধিকারী হইয়াছেন। তিনি সদর্পে জনককে সীতা প্রাপ্তির দাবী জানাইলেন। কিন্তু কোথায় সিদ্ধিশক্তি আর কোথায় ব্রহ্মবিদ্যা। তিনি পরীক্ষায় পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া লজ্জায় পলায়ন করিলেন। তাঁহার এই শোচনীয় পরাজয়ে তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্য স্থানীয় যত যোগী ছিলেন, তাঁহারা সকলেই স্তব্ধ হইলেন এবং নিজ নিজ সাধনমার্গ যে উন্নত নহে তাহা সকলেই বুঝিলেন। কিন্তু সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হওয়ার মত উন্নত অধিকার লাভ করা তাঁহাদের সাধ্যাতীত ব্যাপার বুঝিয়া নিজ নিজ যোগৈশ্বর্য্য বাড়াইবার জন্যই রাজসিকভাবে সাধন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সিদ্ধিশক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া সাধারণ ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগকেই অনুকরণ করিতে লাগিল এবং বৈদিক সাধনমার্গ পরিত্যাগ করিয়া ঐশ্বর্য্য লাভ করিবার জন্য তামসিক ও রাজসিক প্রণালীতে ভগবদ্ভক্তি বিহীন হইয়া ভূত, প্রেত, যক্ষ, রাক্ষসাদির উপাসনায় মনোযোগ করিল। জনকরাজা এই ঘোর দুর্দিনে প্রাণপণে লোকশিক্ষার জন্য নিজে কর্মযোগ সাধনা করিয়া প্রজাদিগকে ঐ সাধনায় প্রবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন—তাঁহার দৃষ্টান্তে তাঁহার রাজ্যের লোকের বিশেষ উন্নতি হইতে লাগিল।

রামের ব্রহ্মবিদ্যালাভ

এদিকে বিশ্বামিত্রের উপদেশ গীতোক্ত কর্মযোগ সাধনা দ্বারা রাম ও লক্ষ্মণ কয়েক বৎসর মধ্যে দৈব সম্পত্তি লাভ করিয়া সাধন-

চতুষ্টয় সম্পন্ন হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের আদর্শ অনুসরণ করিয়া চতুঃপার্শ্বস্থিত গৃহস্থ ও যোগিগণ নিজ নিজ চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনে তৎপর হইলেন। অহল্যা ও তাড়কার ন্যায় কত বিপথগামী সাধক আপনাদের ভ্রম সংশোধন করিয়া পরমানন্দের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন ঃ—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ।।

গী ৩।২১

অর্থাৎ সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করেন, সাধারণ লোকে তাহা অনুকরণ করে ; তিনি যাহা প্রমাণ করেন লোক তাহা মানিয়া লয়। অযোধ্যার নিকটবর্ত্তী স্থানগুলি রামচন্দ্রের যশঃ-কীর্ত্তনে মুখরিত হইতে লাগিল। উপযুক্ত শিষ্য পাইয়া বিশ্বামিত্র নিজ সাধনার সময়ে যোগমার্গে যে সব বাধা পাইয়াছিলেন এবং সেগুলি হইতে উদ্ধার পাইবার নিমিত্ত যে কঠিন সাধনা করিয়াছিলেন, তাহা অকপটে রাম ও লক্ষ্মণকে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া যাহাতে তাঁহারা ঐ সমস্ত দৌর্বল্য হইতে পূর্ণভাবে আত্মরক্ষা করিতে পারেন তাহা বিশেষ করিয়া শিখাইলেন। ইহাই কাব্যের বিশ্বামিত্রদত্ত সরহস্য জৃম্ভকাদি অস্ত্র দান। যখন বিশ্বামিত্র বুঝিলেন যে রাম-লক্ষ্মণ সাধনচতুষ্টয় সম্পন্ন হইয়াছেন, তখন তিনি তাঁহাদিগকে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ গুরু জনকরাজার নিকট লইয়া গেলেন। এবারেও দশরথ ইহাতে বিষম বাধা দিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু

ভগবান্ মানুষকে ব্রহ্মবিদ্যা পথে চালিত করিতে অবতার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনে বাধা কি কখনও কার্যকরী হয়? বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের তেজে দশরথের বাধার চেষ্টা পূর্ণভাবে প্রতিহত হইল। বিশ্বামিত্র রামলক্ষ্মণকে লইয়া মিথিলা গমন করিলেন। জনকরাজা ব্রহ্মবিৎ, অতএব সর্বজ্ঞ। তিনি জানিতেন :ভগবান ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের প্রাদুর্ভাবে কাতর হইয়া মনুষ্যগণকে স্বরূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথে চালিত করিবার জন্য ও রাজসিক এবং তামসিক সিদ্ধি শক্তির হেয়ত্ব ও অনিত্যত্ব প্রদর্শন করিবার জন্য রামরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বিশ্বামিত্র রামলক্ষ্মণকে লইয়া জনকরাজার নিকট গমন করিলে তিনি পরম সমাদরে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। বিশ্বামিত্র তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যার্থী রামলক্ষ্মণের গুরুপদে অভিষিক্ত হইতে বিশেষ অনুরোধ করায় তিনি যথাশাস্ত্র তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মী দীক্ষা দিলেন। এবং বেদান্ত বাক্য শ্রবণ করাইতে লাগিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই সমস্ত বেদান্ত যথাযথ শ্রবণ করাইয়া তাঁহাদিগকে সেইগুলি মনন অর্থাৎ বিচার করাইলেন। এইরূপে রামলক্ষ্মণ জ্ঞানভূমির প্রথম ও দ্বিতীয় স্তর শুভেচ্ছা ও বিচারণা উত্তীর্ণ হইয়া তৃতীয় স্তর অর্থাৎ তনুমানসায় উপস্থিত হইলেন অর্থাৎ এই স্তরে তাঁহাদের নিদিধ্যাসন আরম্ভ হইল। অতঃপর ধ্যানযোগে তাঁহারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের যোগ্যতা লাভ করিতে লাগলেন। প্রবল প্রত্যাহার সাধনায় তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গণ পূর্বেই মনের পূর্ণ বশীভূত হইয়াছিল, এখন অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা মনকে প্রায় লয় করিতে লাগিলেন। মন এখন প্রায় লয় হয় হয় এই অবস্থা প্রাপ্ত হইল। মনের এই লয়োন্মুখ

অবস্থা বর্ণনা করিয়া মহাপুরুষ বিবেকানন্দ একটি গীত রচনা করিয়াছিলেন, তাহা এস্থানে দেওয়ার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

নাহি সূর্য্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর।
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্বচরাচর ॥
অস্ফুট মন আকাশে, জগৎ সংসার ভাসে।
ভাসে ওঠে ডোবে পুণঃ অহং স্রোতে নিরন্তর ॥
সে ধারা বদ্ধ হল শূন্যে শূন্যে মিলাইল।
রহে মাত্র আমি এই ধারা নিরন্তর ॥
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে মিশাইল।
অবাঙ্‌ মনসগোচর বুঝে প্রাণ বোঝে যার।

রাম লক্ষ্মণ এইরূপে মনের লয় কারিতে করিতে ক্রমশঃ ধ্যানের প্রগাঢ়তাদ্বারা সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। মনের সংকল্প ও বিকল্প শেষ হইল। ধ্যানের গাঢ়তায় জগৎ লুপ্ত হইতে লাগিল, ক্রমশঃ বুদ্ধির পর্য্যন্ত অস্তিত্ব তাঁহাদের নিকট লুপ্ত হইল। এইবার সত্তাপত্তি ভূমির শেষ স্তরে উপনীত হইয়া তাঁহারা আত্ম-সাক্ষাৎকার করিলেন অর্থাৎ গুরু জনকরাজা তাঁহাদিগকে ব্রহ্মবিদ্যা-রূপিনী সীতা সম্প্রদান করিলেন। কাব্যের ভাষায় রাম পাইলেন পত্নীরূপে এবং লক্ষ্মণ পাইলেন মাতৃরূপে। এখন এই পত্নীরূপে ও মাতৃরূপে ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্ত হওয়া কিরূপ তাহার একটু বিস্তৃত আলোচনা করা আবশ্যক। ইহা বেদান্তের এবং সমস্ত সাধন

শাস্ত্রের বড় গুহ্য তত্ত্ব। ভোগাভিলাষী মানব আমরা, আমাদের ইহা ধারণা করিবার ক্ষমতা নাই। তথাপি শাস্ত্রের আলোচনা অনুরোধে তোতাপাখীর বুলি ঝাড়ার ন্যায় তাহার অবতারণা করিব। উন্নত শ্রেণীর সাধক ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। সাধারণের ইহা পাঠে কোনও বিশেষ লাভ হইবার আশা নাই। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মের শক্তি অভিন্ন, যেমন অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তির পৃথক করিতে পারা যায় না সেইরূপ ব্রহ্ম (নির্গুণ) ও তাঁহার শক্তি বা প্রকৃতি কখনও পৃথক সত্তা নহে। যখন ব্রহ্মে সৃষ্টি স্থিতি লয় ইহার কিছুই বিকাশ নাই ; তখন সেই অবস্থাকে শাস্ত্র নির্বিশেষ, নির্গুণ পরব্রহ্মরূপে বর্ণনা করে। তখন শক্তি বা প্রকৃতি শক্তিমান্ বা ব্রহ্মের সহিত মিশিয়া অক্রিয়ভাবে অবস্থিত, কিন্তু প্রকাশ না থাকিলেও তাহার অস্তিত্ব লোপ হয় নাই। যেমন আমরা যখন চুপ করিয়া বসিয়া থাকি, তখন যেমন চলিবার বা বলিবার ক্ষমতা আমাদের ভিতর অক্রিয় (latent) অবস্থায় অবস্থিত থাকে। ব্রহ্ম "একোঽহং বহুস্যাং প্রজায়েয়ম্" অর্থাৎ "আমি একা আছি, বহু হইতে ইচ্ছা করি"—এই সংকল্প করিলেন, এই সংকল্পই হইল মহদ্‌ব্রহ্ম বা প্রকৃতির জীবসৃষ্টির জন্য গর্ভধারণের বীজ। এইবার প্রকৃতি প্রকট হইয়া সৃষ্টিস্থিতি লয়াদি ঈশ্বরকার্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই প্রকৃতি ও ব্রহ্ম পৃথক নহেন। ইনি ব্রহ্মেরই স্বকীয়া শক্তি। রাধা ও কৃষ্ণ বা শিব ও শ্যামা একই। বিশ্বস্থিতি সময়ে ব্রহ্ম ও তাঁহার প্রকৃতি যেন লৌকিক ভাষায় স্বামী ও স্ত্রীরূপে কার্য্য করিতেছেন। যতক্ষণ জীবের নাম ও রূপ আছে, ততক্ষণ মায়ারূপিনী প্রকৃতির সকলেই সন্তান এবং বিশ্বজননী মহামায়াকে জীবমাত্রে

মাতৃভাবে দর্শন করে। বেদান্তের এবং তন্ত্রের উচ্চতম সাধক এই জননীকে রমণীরূপে গ্রহণ করেন। ইহা লৌকিক ভাষায় অতি হেয়। কারণ আমাদের মত জীব এই মহাভাব ধারণার অধিকারী নহে। ব্রহ্ম মায়াধীশ, অর্থাৎ মায়া বা প্রকৃতি তাঁহার স্বকীয়া শক্তি। আমাদের মত জীবের ধারণা, ভগবান ও তাঁহার শক্তি যথা, শ্যাম ও রাধা বা হর আর গৌরী যেন আমাদের মত বিবাহিত হইয়া আমাদেরই মত স্বামী ও স্ত্রীভাবে বাস করিতেছেন এবং আমাদের যুগল মূর্ত্তির পূজাও এই ভাবেই হয়। কিন্তু যখনই ব্রহ্ম বা ভগবান্ শিব বা বিষ্ণু নাম ও রূপ গ্রহণ করেন, এবং ঈশ্বর বা দেবতাভাবে পূজিত হন, তখন তাঁহারা আদ্যাশক্তির সন্তান, সেইজন্য শাস্ত্রে শিব, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে মহামায়ার সন্তান বলিয়াছেন। সাধকের গানেও মহামায়াকে শিবের জননী বলা হইয়াছে। যথা ঃ

দীনতারিনী দুরিতহারিনী সত্ত্বরজস্তমত্রিগুণধারিনী ॥
সৃজনপালন নিধনকারিনী সগুণা নির্গুণা শিবস্বরূপিনী।

ত্বং হি কালীতারা পরমা প্রকৃতি, ত্বং হি মীন কুর্ম বরাহ প্রভৃতি
ত্বং হি জলস্থল অনিল অনল, ত্বংহি ব্যোম ব্যোমকেশ প্রসবিনী।

যতক্ষণ "শিব" এই নামে তিনি ব্যক্তিত্ব লইয়া বর্ত্তমান, ততক্ষণ তিনি মহামায়াকে জননীরূপে দেখিবেন। পৃথক অস্তিত্ব পরিত্যাগ করিলেই তিনি মহামায়ী, মায়াধীশ বা ব্রহ্ম। তখন মায়া তাঁহার স্বকীয়া শক্তি ; দেহবিশিষ্টা স্ত্রীমূর্ত্তি নহে। এতএব যতদিন আমি

জীব, আমি ভক্ত, আমার ভক্তির পাত্র ভগবান্, এই দ্বৈত উপাসনা, ততদিন আমরা ব্রহ্মশক্তি বা ব্রহ্মবিদ্যাকে মাতৃজ্ঞানে উপাসনা করিব। এই প্রকৃতি বিদ্যা ও অবিদ্যা এই দ্বিবিধভাবে বিরাজিতা। আমরা সাধারণ জীব, আমরা অবিদ্যাকে জননী মনে করিয়া তাঁহারই অধীনে সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছি, কতবার জন্মিতেছি, কতবার মরিতেছি। যে যোগিগণ বিদ্যাজননীর ভক্তিতে বিহ্বল হইয়া সুখদুঃখের পরপারে ভগবদানন্দ ভোগ করেন, তাঁহারা শাক্ত। বৈষ্ণবগণ পরমা প্রকৃতি বা হ্লাদিনী শক্তিতে নিজ পৃথক্ সত্তা নিমজ্জিত করিয়া পরমপুরুষের সহিত রমণ করিতে চান, আবার ইচ্ছা করিলে কখনও কখনও নির্গুণ ব্রহ্মে নিজ পৃথক সত্তা নিমজ্জিত করিতেও পারেন। ইহা তাঁহাদের বিলাস। নির্বাণ মোক্ষকামী বেদান্তের সাধক নিজ পৃথক অস্তিত্ব নির্গুণ ব্রহ্মে নিমজ্জিত করিয়া পরমাপ্রকৃতির পতিত্ব লাভ করিতে চান। ইহার মধ্যে কোনটীই ছোট বড় নহে। ইঁহাদের প্রত্যেকেরই যে কি নিরুপম অনির্বচনীয় আনন্দ তাহা আমাদের মত ক্ষুদ্র জীবের ধারণার অতীত।

রাম ভগবানের বিশিষ্ট অবতার। জীবকে আদর্শ দেখাইবার জন্য তিনি ত্রেতাযুগে পৃথিবীতে অবতীর্ণ। তিনি সত্তাপত্তিনাম্নী চতুর্থী জ্ঞানভূমিতে সমাধিস্থ হইয়া ব্রহ্মাত্মৈক্য অনুভব করিলেন; এবং ব্রহ্মবিদ্যাকে স্বকীয়া শক্তিরূপে (কাব্যের ভাষায় পত্নীরূপে) গ্রহণ করিতে পারিলেন। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে তিনি স্বয়ং ভগবান্, ইহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না তাঁহাকে সাধন করিয়া এই অবস্থা আনিবার আবশ্যকতা ছিল না। কেবল জীবকে পথপ্রদর্শনের জন্যই তাঁহার যথাশাস্ত্র সাধনা। তিনিই বেদান্তশাস্ত্র

প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। গীতায় আছে ঃ "বেদান্তকৃদ্বেদ বিদেব চাহং"—অর্থাৎ আমি বেদান্তশাস্ত্র সৃষ্টি করিয়াছি। শুধু তিনি কেন? নিত্যসিদ্ধ মহাত্মাদের কাহাকেও সাধনা করিয়া ব্রহ্মত্ব পাইতে হয় নাই। নিত্যসিদ্ধ সম্বন্ধে পরে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইবে। লক্ষ্মণও প্রায় অনুরূপ সাধনায় ঐ ব্রহ্মবিদ্যাকে মাতৃরূপে গ্রহণের অধিকারী হইলেন। তিনি এইরূপে জগতে ভক্তিমাখা শাক্ততত্ত্ব প্রচার করিলেন। বিভীষণ ও হনুমানও মাতৃভাবে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হনুমানের কথা পরে আলোচিত হইবে। যে সত্তাপত্তিনাম্নী জ্ঞানভূমিতে রামলক্ষ্মণ উন্নত হইলেন, তাহার পরেও তারও তিনটী জ্ঞানভূমি আছে। তাহা ক্রমান্বয়ে অসংসক্তি, পদার্থাভাবনী ও তুরীয়া। এই কয়টী ভূমি সমাধির অবস্থা। ইহাদের কোনটীতে অবস্থান করিয়া সংসারে কাজকর্ম করা যায় না। পঞ্চমভূমি অসংসক্তিতে কিছু করা গেলেও ষষ্ঠ ও সপ্তমে কিছু করা প্রায় অসম্ভব। মনুষ্যদিগকে নিজে আচরণ করিয়া শিক্ষা দিতে রামলক্ষ্মণ অবতীর্ণ। তাঁহারা এবং ঈশ্বরকোটীর জীব জনকরাজা এ তিন ভূমিতে প্রবেশ করিলে সংসারে আদর্শ কে দেখাইবে? সেইজন্য সংসারের সমস্ত কর্ত্তব্য কর্মে আবার তাঁহারা ফিরিয়া জীবন্মুক্ত অবস্থায় অবস্থিত। তাঁহারা এখন আর সাধক নহেন। তাঁহারা সিদ্ধ। তাঁহাদের ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হইয়াছে। আর পতনের সম্ভাবনা নাই। তত্ত্বাভ্যাস, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়ের জন্য পঞ্চম ও ষষ্ঠ ভূমিতে সাধনার আবশ্যকতা আছে এবং তাহার অভাবে সাময়িকভাবে ব্রহ্মবিদ্যা অন্তর্হিত হইতে পারে তাহাও নিজে আচরণ করিয়া দেখাইবার জন্য তাঁহারা ঐ জ্ঞানভূমিতে

সাধন না করিয়া জীবহিতার্থ আবার সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। যে যে স্তরের মধ্য দিয়া রাম ও লক্ষ্মণ আত্মস্বরূপদর্শন করিলেন, সেই সেই স্তর এবং তাহাদের নিম্নতর সাধনস্তরগুলি এখানে দেখান আবশ্যক। এই সমস্ত স্তরের সহিত আমাদের আধুনিক বিদ্যা-দানের স্তরের বিশেষ সামঞ্জস্য আছে। আমি নিজে একজন শিক্ষক, সুতরাং ঐ সামঞ্জস্য প্রদর্শনের লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। সাধনার নিম্নতম স্তর বা প্রাথমিক বিভাগ (পাঠশালা) এই স্তরে তামসিক ব্যক্তিগণ নানাবিধ ভূত, প্রেত, পিশাচাদির পূজা করে। যেমন পূজ্য ভূত, তাহার পূজার উপহারাদি নৈবেদ্যও সেইরূপ। অতি ঘৃণিত, পূতি, পর্য্যুষিত, উচ্ছিষ্ট, অমেধ্য দ্রব্যাদি দ্বারা সেই ভূত প্রেতকে সন্তুষ্ট করিয়া ঐ শ্রেণীর সাধকগণ শত্রুর সর্বনাশ, নিজেদের ঘৃণিত নীচ স্বার্থসিদ্ধি, মারণ স্তম্ভন, উচাটন, বশীকরণ ইত্যাদি তাহাদের পূজিত ভূত প্রেতাদির নিকট প্রার্থনা করে এবং তাহাদের নিকট ঐ সমস্ত বর লাভ করে। কিন্তু সত্ত্বগুণী ব্যক্তিদের কোন অপকার করিবার ক্ষমতা ঐ ভূত প্রেতাদি দিতে পারে না। এই সমস্ত সাধককে সর্বদা অপবিত্রভাবে থাকিতে হয় নচেৎ ঐ ভূতেরা অসন্তুষ্ট হইয়া সাধকের সর্বনাশ সাধন করে। মানসিক করিয়া তাহা শোধ না করিলে এই ভূতগণ তাহাদের ভক্তদের প্রতি বিশেষ অত্যাচার করে এবং ভগবৎকথা শুনিলে সে স্থান হইতে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করে। এই শ্রেণীর সাধকগণের তমোগুণ অত্যন্ত অধিক, রজঃ কিঞ্চিৎ থাকে। সত্বগুণ এত অল্প যে, তাহা প্রায় নাই বলিলেই হয়। ইহারাও সাধক শ্রেণীর অন্তর্ভূ্ত। কারণ ভগবান্ বা দেবতা না মানিলেও ইহারা মনুষ্যের

অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাযুক্ত সূক্ষ্মতর দেহধারী কোন ভূত প্রেতের অস্তিত্বে বিশ্বাসী এবং পূজা, স্তব ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা তাহাদের পূজা করিয়া অভীষ্ট ফললাভে সর্বদা যত্নপরায়ণ। ইহাদেরও শাস্ত্র আছে এবং তাহা ও ভগবৎ প্রেরণায় ঋষিরাই প্রণয়ন করিয়াছেন। কারণ ভগবান্ ও ঋষিগণ সকল মনুষ্যকেই উন্নতির দিকে লইয়া যাইতে চাহেন। কাহাকেও ঘৃণা করিয়া বা কাহারও উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করেন না। যে যেমন অধিকারী বা যাহার যেমন: রুচি, তাহার প্রকৃতি অনুযায়ী শাস্ত্র রচনা করিয়া উত্তরোত্তর উন্নতির দিকে লইয়া যান। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, এই সমস্ত তামসিক প্রকৃতির মনুষ্যগণও সাধক শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাদের নিম্নস্তরের মনুষ্যেরা এখনও সাধনার কোন স্তরেই প্রবেশ করে নাই। আধুনিক শিক্ষা-দানের ভাষায় তাহারা এখনও পাঠশালায়ও প্রবেশ করে নাই। ইহারা আসুরিক। ভগবান্ গীতায় প্রায় সমস্ত ষোড়শ অধ্যায়টীতে ইহাদের প্রকৃতি ও কার্যাবলী বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে বলিয়াছেন ইহারা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি জানে না। ইহাদের শৌচ বা আচার জ্ঞান নাই। ইহারা সত্য পথ হইতে ভ্রষ্ট। ইহারা মনে করে মিথ্যার আশ্রয় ব্যতীত জগৎ চ'লে না। জগতের আশ্রয় স্বরূপ কোন ঈশ্বর নাই, স্ত্রী পুরুষের কামভোগ দ্বারাই জীবের সৃষ্টি হয়। এই সমস্ত লোক অতি উগ্রকর্মা, নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য জগতের সকলের অহিত সাধন করে। ইহাদের কামনার কখনও পূরণ হয় না। ইহারা দম্ভ, মান ও মদান্বিত হইয়া অন্যায়ভাবে পরের সর্বস্ব অপহরণ করিতে সর্বদা উদ্যত। ইহারা দেবতা, যক্ষ, রাক্ষস বা ভূত প্রেত প্রভৃতি কোনও

অলৌকিক বস্তুতে বা ব্যক্তিতে বিশ্বাস করে না। ইহারা কঠোর পরিশ্রম করিয়া আপনাদের সুখভোগের উপকরণ প্রস্তুত—ভোগায়তন দেহকে ভোগক্ষম রাখিবার জন্য নানাবিধ ঔষধ আবিষ্কার ও হঠযোগ সাধন এবং জড়বিজ্ঞানের গভীর গবেষণা দ্বারা লোকনাশের জন্য অদ্ভুত প্রকারের অস্ত্রাদির নির্মাণ ইত্যাদি কার্যে দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করে। এখন এইরূপ চরিত্রের লোকের সংখ্যা শতকরা ৮০ জন। আধুনিক রুশিয়াবাসিগণ এবং ফরাসীগণ এই জাতীয় মনুষ্যের শীর্ষস্থানীয় এবং বর্ত্তমানের মহাযুদ্ধ এই আসুরিক সম্পত্তিশালী ব্যক্তিদের মধ্যেই হইতেছে। এই যুদ্ধের ফলে তাহাদের অধিকাংশের চক্ষুঃ উন্মীলিত হইবে এবং তাহাদের কেহ কেহ আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ব্যগ্র হইয়া তামসিক সাধনারূপ পাঠশালায় প্রবিষ্ট হইবে। ভগবান তাহাদের উন্নতির জন্যই এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ জগতে আরম্ভ করাইয়াছেন।

সাধনার দ্বিতীয় স্তর বা মাধ্যমিক বিভাগ (Secondary Dept.) তামসিক শ্রেণীর সাধকগণ ভূত প্রেতাদির সাধনায় ক্লান্ত ও বিরক্ত হইয়া ক্রমে যক্ষ, রাক্ষস এবং নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে কল্পিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিযুক্ত এবং পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষ্যাদ্বেষাদিযুক্ত দেবতার আরাধনা দ্বারা অর্থ, স্বাস্থ্য, মান, শত্রুর ক্ষতি ইত্যাদি লাভে চেষ্টা করে। এই স্তরের নিম্নতম শ্রেণীগুলিতে সাধকগণ পৃথিবীতে ভোগ ও ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি ব্যতিত পরলোকের উন্নতি বা অধোগতির দিকে প্রায়ই কিছুমাত্র লক্ষ্য করে না। ইহারা পরজন্ম মানিলেও পুনরায় মানুষ হইয়া বিচিত্র ভোগ পাইবার আশায় সাধনাদি করে। এই শ্রেণীর সাধকের পূজনীয় দেবদেবী প্রায়ই

দৈহিক ব্যাধির নাশকারী বা অর্থ ও ভোগাদিকারী যথাঃ বসন্ত ব্যাধি হইতে পরিত্রাণকারিণী শীতলা, কলেরা নিবারিণী রক্ষাকালী, ওলাইচণ্ডী বা ওলাধিবি ; সর্পাঘাত হইতে রক্ষাকারিণী মনসা বা বিষহরী, ; বাতব্যাধি হইতে রক্ষক ভুবনেশ্বর ; অজীর্ণ রোগ নাশকারী বৈদ্যনাথ ; সন্তান দায়িকা ও দায়ক ষষ্ঠী ও পঞ্চানন। ইহারা শিব ও কালীকেও পূজা করে। কিন্তু জানে যে তাঁহাদের শক্তি ঐ ব্যাধিনাশের গণ্ডীর মধ্যেই বা অর্থাদি দানেই পরিসমাপ্ত। সমাজের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে 'ধর্ম' নামে এক দেবতার পূজা হয়। তাঁহার ভক্তগণ মদ্যমাংসহীন স্বর্গে গমন করিতে সম্মত নন। ইঁহারা ব্যতীত ঘণ্টাকর্ণ, সুবচনী, সত্যপীর, ধনদায়িনী লক্ষ্মী, শ্মশানকালী, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি দেশ ভেদে নানা দেবতার পূজা ও ব্রত এই শ্রেণীর সাধকগণ শ্রদ্ধার সহিত সম্পাদন করেন। ইঁহারা পরের সর্বনাশ করিয়া নিজেদের উন্নতি করিতে চাহেন না—নিজেদের পার্থিব উন্নতির দিকে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য রাখেন। ক্রমশঃ উন্নত হইতে হইতে ইঁহারা অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণীর দেবগণকে অর্থাৎ গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, ব্রহ্মা, অগ্নিকে উপাসনা করেন। কিন্তু ইঁহাদের কাহাকেও ভগবান্ বলিতে সম্মত নন। পুরাণে ঐ সমস্ত দেবতার যে ঐশ্বর্যাদি বর্ণিত আছে, সেইগুলির জন্য উঁহাদিগকে বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করেন এবং যেখানে যে দেববিগ্রহের বিশেষ ঐশ্বর্য আছে অর্থাৎ যাঁহার স্বর্ণ রৌপ্যাদি অলঙ্কার, মর্মর প্রাসাদ ও অনেক সম্পত্তি আছে কিংবা যিনি বিশেষ জাগ্রত অর্থাৎ মানসিক করিলে সদ্য ফলদান করেন সেই দেবতাগুলিকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া তাঁহাদের নিকট অর্থ ভোগ্য পদার্থ,

ব্যাধিশান্তি, আগামী জন্মে সুখ সম্পত্তি ও পুত্রলাভ এবং স্বর্গভোগ প্রার্থনা করেন। ইঁহারা লোকহিতকর নানা কর্ম করিয়া পুণ্যলাভ করিতে ও স্বর্গে যাইতে ইচ্ছুক হন। দীনদুঃখীদিগকে অন্নবস্ত্রাদি দান, চিকিৎসালয় এবং বিদ্যালয় নির্মাণ, পুষ্করিণী আদি প্রতিষ্ঠা, সাধুসন্ন্যাসীর সেবার জন্য মঠ স্থাপন ইত্যাদি নানা লোকহিতকর কর্ম পূর্ণ সকামভাবে অনুষ্ঠান করেন। এই সমস্ত উন্নত কর্মের ফলে ইঁহাদের চিত্তের তামসিক ও রাজসিক ভাবগুলি ক্রমশঃ অভিভূত হওয়াতে সত্বগুণের অবির্ভাব হইতে থাকে। পৃথিবীতে নানা ভোগ ও স্বর্গে নানা সুখ ও ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়ভোগ্য পদার্থনিচয়ে ইঁহারা বীতস্পৃহ হইতে থাকেন। এইবার ইঁহারা দেবদেবীগণকে ভগবান্ হইতে পৃথক্ না দেখিয়া তাঁহারই বিভূতি বা অংশরূপে দেখিবার শক্তি সঞ্চয় করেন, এবং ভগবল্লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হন। সুরেন্দ্রলোকের ক্ষণভঙ্গুর ভোগ আর তাঁহাদিগকে লুব্ধ করিতে পারে না। পার্থিব ও স্বর্গীয় সমস্ত সুখভোগকে তাঁহারা ঘৃণা করিতে আরম্ভ করেন। পুত্র পৌত্রাদি আত্মীয়গণের প্রতি স্নেহ ও ভালবাসায় আর তাঁহারা তৃপ্তি পান না। মনে মনে মর্য্যাদার প্রাপ্তিতে তাঁহারা আর পূর্বের ন্যায় আনন্দ অনুভব করেন না। এইবার তাঁহাদের দ্বিতীয় স্তরের বা স্কুলের পাঠশেষ হইল ইঁহার পরবর্ত্তী স্তরে তাঁহারা উন্নীত হইলেন।

সাধনার তৃতীয় স্তর = গীতোক্ত কর্মযোগ (College class) পার্থিব ও স্বর্গীয় ভোগে বিশেষ সুখ না পাইয়া সাধক এখন স্থায়ী নির্মল আনন্দ ও জ্ঞান পাইবার জন্য উদগ্রীব হন এবং সমস্ত দেবগণ যে ভগবানের বিভূতি ও তাঁহার নিয়োগে জগৎ রক্ষা করিতেছেন,

তাহা বুঝিতে ক্রমশঃ সমর্থ হন। এখন তাঁহারা এই সর্বশক্তিমান্ সর্বনিয়ন্তা ভগবানের উপাসনার জন্য ব্যগ্র হন। সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের কিয়দ্দিন পর্য্যন্ত তাঁহারা অতি সত্ত্বর পূর্বস্তরের সকাম দেবোপাসনা শেষ করিয়া কর্মযোগে প্রবেশ করিতে পারিতেন। দ্বাপরের মধ্য হইতেই ভোগ্য পদার্থের দিকে লোভবশতঃ মানুষ ভগবান্‌কে কর্মযোগ দ্বারা আরাধনা করিতে বিস্মৃত ও অশক্ত হইতে লাগিল। ভগবান্ গীতায় চতুর্থ অধ্যায়ে বলিয়াছেন ঃ

"যে কর্মযোগ আমি সৃষ্টির পরে সূর্যকে উপদেশ দিয়াছিলাম এবং যাহা সত্য ও ত্রেতা যুগে রাজর্ষিগণ আচরণ করিতেন, কালক্রমে এখন দ্বাপরে তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে"। তিনি অর্জুনকে সেই কর্মযোগ সাধন শিখাইয়াছিলেন। সমস্ত গীতাতে ঐ যোগ সাধনের প্রণালী বর্ণিত আছে। কিন্তু তিনি জানিতেন যে, সন্নিহিত কলিযুগে ঐ কঠিন কর্মযোগ সাধন করিতে সাধারণ মানবগণ সমর্থ হইবে না। সেইজন্য গীতার নবম হইতে পঞ্চদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত সুখসাধ্য ভক্তি যোগের উপদেশ দিয়াছেন। এই ভক্তিযোগ কর্মযোগ অপেক্ষা অনেক সুসাধ্য। কর্মযোগে নিজ নিজ স্বভাবগত শাস্ত্রীয় কর্ত্তব্য কর্ম ভগবানে ফল সন্ন্যাস ও "আমি কর্ম করিতেছি"—এই অহঙ্কার বা আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া চিত্তশুদ্ধির জন্য করাই জ্ঞান-লাভ বা সন্ন্যাস প্রাপ্তির প্রকৃষ্ট উপায় ; ইহা ভগবান্ গীতায় দেখাইয়া-ছেন। কিন্তু কলিকালে তাহা সাধারণ মানবের সাধ্যের বহির্ভূত। সেইজন্য তিনি সাধককে প্রথমে পুরাণ ও বেদের কর্মকান্ডোক্ত দেবদেবীগণের পূজা পরিত্যাগ করিয়া ভগবান্‌কে ভালবাসিয়া ও তাঁহার উপর নির্ভরতা আনয়ন করিয়া তাঁহার জপ, কীর্ত্তন ও

প্রণামাদির দ্বারা তাঁহার প্রতি আসক্ত হইতে উপদেশ দিয়াছেন এবং এইরূপে উন্নীত হইবার জন্য সর্বদা তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিতে বলিয়াছেন। এইরূপ করিতে করিতে তাঁহারা অনতিবিলম্বে ভগবানে ফল সমর্পণ করিতে ও কর্তৃত্বাভিমান বিসর্জন করিতে সমর্থ হন এবং কর্মযোগ সাধনে ক্রমশঃ পরিপক্ক হইয়া ইন্দ্রিয় ও মনকে বশীভূত করিয়া, প্রত্যাহার, ধারণা ও ধ্যান দ্বারা সর্বভূতে আত্মদর্শনরূপ কর্মযোগসিদ্ধি লাভ করেন। তখন তাঁহারা পূর্বোক্ত সাধনচতুষ্টয় সম্পন্ন হন। এই স্তরের সাধনায় উত্তীর্ণ হইলে স্থিতপ্রজ্ঞত্ব লাভ হয় এবং ঐ অবস্থায় দেহত্যাগ ঘটিলে আর পুণরায় সংসারে আসিতে হয় না – দেবযানে ব্রহ্মলোক, গোলোক বা কৈলাসে গতি হয়।

সাধনার চতুর্থ বা শেষ স্তর—Post Graduate Class. সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন কর্মযোগ সিদ্ধ মানব পূর্ববর্ণিত সন্ন্যাসের অধিকারী হন। তখন সংসার ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকট ব্রাহ্মী দীক্ষা গ্রহণ পূর্বক বেদান্ত বাক্য শ্রবণ, তাহা সর্বদা বিচার ও ক্রমশঃ ব্রহ্মধ্যান করিতে করিতে পূর্বোক্ত সপ্তজ্ঞানভূমি অর্থাৎ শুভেচ্ছা, বিচারণা, তনুমানসা, সত্তাপত্তি, অসংসক্তি, পদার্থাভাবনী, ও তুরীয়ায় উপস্থিত হন। চতুর্থী ভূমিতে অর্থাৎ সত্তাপত্তিতে ব্রহ্মদর্শন হয়। তৎপরে তিনভূমি সমাধির ভুমি— এই তিনভূমিতে তত্ত্বাভ্যাস, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় দ্বারা সমাধির প্রগাঢ়তা ও অধিকদিন স্থায়িত্ব লাভ হয়। পঞ্চম ভূমিতে সমাধি হইতে আপনা-আপনি ব্যুত্থান হয়। ষষ্ঠে পরপ্রযত্ন ব্যতীত ব্যুত্থান হয় না এবং সপ্তমে আর ব্যুত্থান একেবারেই হয় না। দেহের পোষণভাবে দেহ শুষ্ক হইয়া যায়। দেহের দিকে আর তাঁহারা মন আনিতে

পারেন না। মনের ও বুদ্ধির লয় হয়। তখন সিদ্ধব্যক্তি আত্মস্বরূপে অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মে প্রবেশ লাভ করেন। ঈশ্বর কোটীর জীব প্রবেশ লাভ করিয়াও আবার জীবহিতার্থ সংসারে আসিয়া কর্ম করিতে পারেন। অন্যে আর পৃথক্ সত্তা আনিতে পারে না। ইহাই জীবের ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্তি।

রামের বনগমন

রাম ও লক্ষ্মণ ব্রহ্মবিদ্যা সীতা লাভ করিয়া জনকরাজার নিকট হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ভারতের সর্বত্র যোগী ও ঋষিগণ ধন্য ধন্য করিয়া উঠিলেন। আসুরিক সিদ্ধি শক্তির সাধক রাবণরাজার শিষ্য ও প্রশিষ্যগণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। তাঁহারা জানিতেন তাঁহাদের যেরূপ শক্তি লাভ হইয়াছে, তাহাতে ব্রহ্মবিদ্যা বা সীতা তাঁহাদেরই প্রাপ্য। বালক রাম কি শক্তি ধারণ করেন যে, তাঁহার ঐ বিদ্যালাভ হইবে? তাঁহারা রামের বিরুদ্ধে ঘোর ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সংখ্যা তখন অতীব প্রবল। সর্বত্র তাঁহাদের দলের সাধক বর্ত্তমান। কিরূপে সংসার হইতে ব্রহ্মবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্ বা রাম সীতা ও লক্ষ্মণকে বিদূরিত করিতে পারা যায় তাঁহারা সেজন্য প্রাণপণ চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। সুযোগও মিলিয়া গেল। রামলক্ষ্মণ যতদিন জনকরাজার নিকট অধ্যাত্মবিদ্যা সাধন করিতেছিলেন, ততদিন দশরথ রামলক্ষ্মণ অর্থাৎ সত্ত্বগুণ ও সত্ত্বাশ্রিত রজোগুণের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়া বার্দ্ধক্যে

তমোগুণাক্রান্ত হইতেছিলেন। সত্ত্বগুণময়ী কৌশল্যাও রজোগুণময়ী সুমিত্রার সৎসঙ্গ তাঁহার আনন্দোৎপাদন করিতে পারিল না। তিনি তমোগুণময়ী কৈকেয়ীর ক্রীতদাসরূপে পরিণত হইতে লাগিলেন। রাবণরাজার শিষ্য প্রশিষ্যগণ এই সংবাদ পাইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। দশরথ বশিষ্ঠ ও অমাত্যগণের অনুরোধে এবং স্বীয় বার্দ্ধক্যবশতঃ রাজ্যপালনরূপ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বংশের চিরাচরিত প্রথানুযায়ী বানপ্রস্থ গ্রহণ করিবার পূর্বে রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া কিছুদিন তাঁহাকে রাজকর্ত্তব্য পালন বিষয়ে শিক্ষা দিতে মনস্থ করিলেন। তাঁহাদের বংশের চিরন্তন পদ্ধতি এই যে যিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র হইবেন, তিনিই রাজ্যভার প্রাপ্ত হইবেন। ঐ জ্যেষ্ঠপুত্র ইচ্ছাপূর্বক রাজ্যভার ত্যাগ করিলে বা ধর্মশাস্ত্রের বিধানানুসারে রাজ্য প্রাপ্তির অযোগ্য বিবেচিত হইলে তখন তৎপরবর্ত্তী পুত্রের রাজ্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিত। রামই জ্যেষ্ঠ এবং সর্বগুণসম্পন্ন, পিতার এবং রাজ্যের সকলেরই পরম প্রীতির পাত্র; কাজেই দশরথ একান্ত আগ্রহ সহকারে রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে দিন স্থির করিলেন। এমন সময় রাবণের অনুচরগণ নিজেদের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য তমোগুণময়ী কৈকেয়ীর দ্বারা রামকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য কৌশল অবলম্বন করিল। এখন কৈকেয়ীর করতলগত দশরথের অবস্থা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। দশরথ একজন সাধক পুরুষ, উচ্চশ্রেণীর মনুষ্য। তিনি বংশপরম্পরায় কর্মযোগে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া নিয়মিতভাবে ও অনাশক্তির সহিত রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। জগতের সমস্ত জীবের সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন

গুণই আছে, তাঁহারও তাহা ছিল—তাঁহারা যেন কৌশল্যাদি তিন রাণী। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন ঃ

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতি সম্ভবা ঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো ! দেহে দেহিনমব্যয়ং ॥

গী ১৪।৫

অর্থাৎ হে মহাবাহো ! এই অব্যয় আত্মস্বরূপ দেহীকে প্রকৃতি সম্ভুত—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ দেহে বদ্ধ করিয়া রাখে। অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলিয়াছেন ঃ—

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভির্গুণৈঃ ॥

গী ১৮।৪০

অর্থাৎ পৃথিবীতে এবং স্বর্গেও দেবতাদের মধ্যে এমন কোনও জীব নাই, যিনি প্রকৃতিজাত এই তিন (সত্ব, রজঃ ও তমঃ) গুণ হইতে মুক্ত। ব্রহ্মাদি—স্থাবরান্ত প্রত্যেক জীবে এই তিন গুণের তারতম্য আছে এই তারতম্যানুসারে প্রত্যেক জীব কিছু না কিছু ভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট হইবে। দেহ ও মনের অবস্থাভেদে, পারিপার্শ্বিক ঘটনা দ্বারা এবং সাধনার তীব্রতা বা মন্দতায় দ্বারা এক এক সময় একটা গুণ অপর দুইটিকে অভিভূত করিয়া স্বকার্য্য সাধন করে। সত্ত্বগুণ যখন প্রবল হয় তখন মন ও বুদ্ধি জ্ঞানযুক্ত হয় এবং ইন্দ্রিয়গণ ঐরূপ জ্ঞানযুক্ত মন ও বুদ্ধির অধীনে সৎকর্ম সম্পাদন

করিতে থাকে। মানুষের অধ্যাত্ম সাধনা ঐ সময় সুন্দররূপে সম্পাদিত হয়। রজোগুণ প্রবল হইলে লোভ, নানা কার্য করিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিবার প্রবৃত্তি নানা ভোগ্য পদার্থ পাইবার আকাঙ্ক্ষা, ইত্যাদি উপস্থিত হয়। তখন মনুষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও নিষ্কাম পরহিতকর কর্মাদিতে বাধা উপস্থিত হয়। তমাগুণ প্রবল হইলে জ্ঞানলোপ, কর্ত্তব্য কর্মে অনিচ্ছা, নানা প্রকার প্রসাদ ও ভুলভ্রান্তি ও অনবধানতা এবং বুদ্ধির মালিন্য উৎপন্ন হয়। শেষোক্ত দুইটি গুণ যত প্রবল হয়, ততই জীব অবনতির দিকে অগ্রসর হয়। সাধকগণ রজঃ ও তমোগুণ যাহাতে প্রবল না হইতে পারে, তজ্জন্য সর্বদা সতর্ক থাকেন এবং অন্তঃকরণে উহাদের আবির্ভাব জানিতে পারিলেই দৃঢ় সংযমের অভ্যাস দ্বারা তাহাদিগকে দমন করিয়া সত্ত্বগুণের অধীন করিয়া দেন।

রাম ও লক্ষ্মণের মিথিলা গমনের পর তাঁহাদের অনুপস্থিতিতে দশরথ বার্দ্ধক্যসুলভ আলস্য ও প্রমাদবশতঃ ক্রমশঃ সাধকোচিত সতর্কতা বিস্মৃত হইতে লাগিলেন। কৌশল্যা ও সুমিত্রা অপেক্ষা কৈকেয়ী তাঁহার নিকট প্রিয়তমা মনে হইতে লাগিল। পূর্বে সত্ত্বগুণময়ী কৌশল্যা ও রজোগুণময়ী সুমিত্রার প্রভাবে তমোগুণময়ী কৈকেয়ী বাধ্য হইয়া রাজার সাধন পথে ও কর্ত্তব্য সাধনে বাধা আনিতে সমর্থ হইত না। তিনগুণই যেমন জীবের মধ্যে একত্র বাস করিয়া বন্ধুভাবেই থাকে, সেইরূপ এই তিন রাণীই একত্র থাকিয়া রাজার উপকারই করিতেন। ক্রমে রাজা কৌশল্যা ও সুমিত্রার সঙ্গ পরিহার করিতে আরম্ভ করিলেন। কৈকেয়ীর পূর্ণ আধিপত্য জন্মিল। সঙ্গে সঙ্গে রাবণ রাজার অনুচরগণ সর্বদা প্রচ্ছন্ন-

ভাবে তমোগুণময়ী কৈকেয়ীকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। তাহাদের একান্ত ইচ্ছা যে, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণান্বিত রাম, বিশুদ্ধসত্ত্বাশ্রিত রজোরূপী লক্ষ্মণ ও ব্রহ্মবিদ্যাময়ী সীতা লোকালয় ও সমাজ হইতে দূরীভূত হন এবং রাজ্যের সকলে যাহাতে কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ অনুযায়ী কোনও সাধন করিতে বা ঐ সমস্ত বিষয়ে কোনও উপদেশ পাইতে বা আদর্শ দেখিতে না পারে। মন্থরানাম্নী এক দাসীর সাহায্যে ঐ চরগণ দশরথের অন্তঃপুরে তমোগুণময়ী কৈকেয়ীর মনোমহনকারী সুখ-সমৃদ্ধির চিত্র অঙ্কিত করিয়া যাহাতে রাম ও সীতা সমাজমধ্য হইতে বিতাড়িত হন সে বিষয়ে তাহারা প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। দশরথ এখন সত্ত্ব ও রজের সাহচর্য্যে বঞ্চিত। অতএব তমোগুণের প্রবল প্রভাব হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার সামর্থ্য তাহার নাই। মন্থরার পরামর্শক্রমে কৈকেয়ী এখন নিজের কবলে পতিত দশরথকে নিজ পুত্র ভরতের জন্য রাজ্য ও রামলক্ষ্মণ সীতার চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস এই দুইটি অভীষ্ট প্রার্থনা করিলেন। রামগতপ্রাণ সাধক দশরথের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি নিজের দৌর্বল্য পূর্ণভাবে অনুভব করিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়! তাঁহার শক্তি কোথায় যে এই ঘোর অপকার্য্যের প্রতিকূলাচরণ করেন। সত্ত্ব-গুণময়ী কৌশল্যা এবং রজোগুণময়ী সুমিত্রার সাহায্য প্রমত্ত হইয়া ত্যাগ করিয়া মোহ ও প্রমাদগ্রস্ত জীব যখন অকূল পাথারে পড়িয়া কৈকেয়ীর কৃপা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। বিপদের উপর বিপদ। ভরত ও শত্রুঘ্নও আবার বহুদিন হইতে অযোধ্যায় অনুপস্থিত। ভরত তমোগুণময়ী কৈকেয়ীর পুত্র হইয়াও সাধক দশরথের পুত্র বলিয়া এবং বিশুদ্ধসত্ত্বগুণী রামের সাহচর্যে উন্নত চরিত্র এবং রামের

বিশিষ্ট ভক্ত। তিনি যদি জানিতেন তাঁহার জননী সর্বগুণসম্পন্ন ও যথার্থ রাজ্যাধিকারী রামচন্দ্রকে বিতাড়িত করিয়া তাঁহাকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছেন, তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেন। কিন্তু ভগবান্ যে কার্য্যের জন্য আজ সংসারে অবতীর্ণ, তাহার অন্যথাচরণ করিবার সামর্থ্য কাহার আছে? কাজেই ভরত ও শত্রুঘ্ন সেই সময়ে ভরতের মাতুলালয়ে দূরদেশে অবস্থিত। এই সংবাদ পাইয়া কৌশল্যা ও সুমিত্রা রাজার নিকট আসিবার সুযোগ পাইবার পূর্বেই কৈকেয়ী, রাম ও লক্ষ্মণকে আহ্বান করাইয়া রাজা তাঁহাকে স্বেচ্ছায় তাঁহাদের বনগমন ও ভরতের রাজ্য-প্রাপ্তিরূপ দুইটি বর তাঁহাকে দিয়াছেন ইহা জানাইয়া পিতৃসত্য পালনার্থ অবিলম্বে সীতা সহ তাঁহাদিগকে বনে যাইবার আদেশ দিলেন। দশরথ কাঁদিয়া ভূমিতে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। তিনি কোনও কথা বলিতে পারিলেন না। কেবল হা রাম! হা রাম! এই শব্দ করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র বিমাতার বাক্য পিতার অনুমোদিত ইহা ধারণা করিয়া পিতৃআজ্ঞা পালনার্থ সত্বর সীতা ও লক্ষ্মণসহ অযোধ্যা ত্যাগ করিলেন। কৌশল্যা, সুমিত্রা ও অযোধ্যার অধ্যাত্মসাধনেচ্ছু ভক্তগণের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। তাঁহারা উন্নত আদর্শ হারাইয়া চারিদিকে আসুরিক শক্তির কবল হইতে উদ্ধার প্রাপ্তির জন্য ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিলেন। রাজা এই নিদারুণ শোক সহ্য করিতে পারিলেন না এবং আপনার এই দারুণ অধঃপতনে এত তীব্র অনুতাপ উপস্থিত হইল যে কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁহার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হইল। ভরত ও শত্রুঘ্ন এই দারুণ সংবাদ শ্রবণ করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া

পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিয়া বনে যাইয়া রামকে রাজ্য লইতে অনুনয় করিলেন। কিন্তু রাম তাহাতে সম্মত হইলেন না। কাজেই ভরত তাঁহার প্রতিনিধিরূপে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া রাজ্যশাসন করিয়া তাঁহার প্রত্যাবর্তন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

রামের গুহক চণ্ডালের সহিত মিলন

সত্যযুগে এবং ত্রেতাযুগের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত সত্ত্বগুণের পূর্ণ বিকাশ থাকায় সাধকগণ সংসারাশ্রমেই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতে পারিতেন এবং তাঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উন্নত সিদ্ধ ব্রহ্মবিদ্‌গণ জীবন্মুক্ত, গুণাতীত ও স্থিত প্রজ্ঞ অবস্থায় লোক শিক্ষার্থ সংসারের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম পূর্ণ অনাসক্তির সহিত সম্পন্ন করিতেন। কেহ কেহ বনে গমন করিয়া অসংসক্তি ও পদার্থাভাবনী নাম্নী পঞ্চম ও ষষ্ঠ জ্ঞানভূমিতে সাধন করিতে করিতে তত্ত্বাভ্যাস, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় জন্য ধ্যান ও সমাধি অবলম্বন করিতেন এবং তুরীয়ানাম্নী সপ্তম জ্ঞানভূমিতে উন্নীত হইয়া দেহত্যাগ করিতেন। জনকাদি রাজর্ষিগণ সমাজের আদর্শরূপে সংসারে বাস করিয়া গুণাতীত অবস্থায় কর্ম করিতেন। কিন্তু ত্রেতাযুগের শেষে রাজসিকতা, তামসিকতা ও আসুরিকতা প্রবল হইতে থাকায় লোকে কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ পরিত্যাগ করিয়া শক্তিসিদ্ধি লাভের ইচ্ছায় অশাস্ত্রবিহিত আসুরিক যোগাদি অবলম্বন করিতে লাগিল।

ভগবান্ রামচন্দ্র ঐ সমস্ত আসুরিক সাধনার দ্বারা প্রাপ্ত সিদ্ধি-শক্তির হেয়তা ও অনিত্যতা প্রদর্শন করিয়া বেদান্তধর্ম পুনঃ প্রবর্তন ও সংসার আশ্রমে অবস্থিত থাকিয়াও যাহাতে মনুষ্যগণ ব্রহ্মমার্গে বিচরণ করিতে পারে তাহা দেখাইবার জন্য অবতার গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু রাজসিক, তামসিক ও আসুরিক ভারাক্রান্ত সমাজ তাহা সহ্য করিতে পারিল না। কাজেই রামচন্দ্র এখন সংসারে কোনও কর্ত্তব্য না দেখিয়া তত্ত্বাভ্যাস, মনোনাশ ও বাসনা-ক্ষয়ের দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা সুন্দররূপে আয়ত্ত করিবার জন্য এবং সংসার-ত্যাগী বনবাসী ঋষিগণকে রাবণরাজার অনুচরগণের প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া মোক্ষমার্গে পরিচালিত করিবার জন্য বনে গমন করিলেন। পূর্বে বলিয়াছি যে, সংসারাশ্রমের গৃহস্থগণ যেমন রাবণাদি অসুরের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া বৈদিক সাধনমার্গ পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধি ও শক্তিলাভের উদ্দেশ্যে আসুরিক সাধনা করিতে প্রলুব্ধ হইতেছিল, বনবাসী ঋষিগণও ঐ প্রভাব হইতে অনেক ক্ষেত্রে নিস্তার পান নাই।

ঋষিদের অবলম্বিত বৈদিক যোগমার্গ হইতে তাঁহাদিগকে ভ্রষ্ট করিবার জন্য সহস্র সহস্র রাবণানুচর তপোবনে বাস করিত এবং ঋষিদের তপস্যার দারুণ বিঘ্ন উৎপাদন করিত। তাঁহারা সর্বদা ভগবানের অবতারের জন্য প্রার্থনা করিতেন। যখন তাঁহারা বুঝিলেন রামচন্দ্র বনে আগমন করিতেছেন, তখন তাঁহাদের আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহারা রামের প্রতীক্ষায় উদগ্রীব হইয়া রহিলেন। তাঁহারা জানিতেন রাম স্বয়ং পরব্রহ্ম এবং সীতা পরমা প্রকৃতি বা ব্রহ্মবিদ্যা। পৃথিবীতে ব্রহ্মমার্গে মনুষ্যকে

লইয়া যাইবার জন্যই তাঁহাদের অবতার। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যতক্ষণ পরব্রহ্মে পৃথক সত্তা পূর্ণরূপে নিমগ্ন না হয় অর্থাৎ জীব নাম ও রূপযুক্ত হইয়া বিচরণ করেন ততক্ষণ তিনি কিরূপে ব্রহ্মবিদ্যাকে স্বকীয়শক্তি রূপে ধারণা করিতে পারেন? লক্ষ্মণ সীতাকে মাতৃরূপে এবং জনক রাজা তাঁহাকে কন্যারূপে ধারণা করিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তমভূমিতে প্রবেশ না করিয়া এবং নিজের পৃথক্ সত্তা বা নিজ নাম ও রূপ রক্ষা করিয়াও সীতারূপিনী ব্রহ্মবিদ্যাকে স্বকীয়শক্তিরূপে ধারণা করিলেন কিরূপে? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, ইহা অতি সত্য কথা যে পৃথকসত্তা যতদিন থাকিবে, ততদিন ব্রহ্মবিদ্যা বা পরমা প্রকৃতিকে স্বকীয়া শক্তিরূপে ধারণা করিতে সাধক বা সিদ্ধ কেহই সমাধি ভিন্ন অন্য সময়ে পারিবেন না। কিন্তু সিদ্ধ দুই প্রকারের আছে—সাধনসিদ্ধ ও নিত্যসিদ্ধ। শিবকে শাস্ত্রে সাধনসিদ্ধের আদর্শরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি যোগিশ্রেষ্ঠ, সকল যোগির আদর্শস্থানীয়। পূর্ণ বৈরাগ্য সহকৃত ধ্যান ও সমাধির ফলে তিনি জগজ্জননী পরমা-প্রকৃতিকে স্বকীয়া শক্তিরূপে পাইলেন নিজ পৃথক্সত্তা পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণব্রহ্মে প্রবেশ করিয়া। এখন আর তাঁহার ব্রহ্মব্যতিরিক্ত অন্য পৃথক্ সত্তা নাই। কিন্তু পৌরাণিকগণ রামকে বা কৃষ্ণকে কোথায়ও যোগ ও তপস্যা করিয়া ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে হইয়াছে, ইহা বর্ণনা করেন নাই। কৃষ্ণকে সর্বদা যোগেশ্বর এবং শিবকে সর্বত্র যোগীশ্বর বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। রাম ও কৃষ্ণকে নিত্যসিদ্ধ পূর্ণ পরব্রহ্ম দেখানই পৌরাণিকগণের অভিপ্রেত। অবশ্য কেহ যেন রাম, কৃষ্ণ ও শিবকে পৃথক মনে না করেন। জীবকে

উপদেশ দিবার জন্য এবং তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সাধনপথে অগ্রসর করাইবার নিমিত্ত এক ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন ভাব বর্ণনা করা হইয়াছে। রাম নিত্যসিদ্ধ পরব্রহ্ম। তাঁহাকে সাধনা করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতে হয় না। লাউ কুমড়া গাছে অগ্রে ফল ও তৎপরে ফুল। কিন্তু অন্যান্য গাছে অগ্রে ফুল ও তৎপরে ফল। নিত্যসিদ্ধ অগ্রে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া পরে জীবকে আদর্শ দেখাইবার জন্য সাধন করেন। সাধন সিদ্ধগণ অগ্রে সাধন করিয়া তাহার ফলে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন। কাজেই পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম ভূমিতে প্রবেশ না করিয়াও চতুর্থী ভূমিতে রামচন্দ্র সীতারূপিনী ব্রহ্মবিদ্যাকে স্বকীয়শক্তিরূপে ধারণা করিলেন। তিনি ভগদবতার, কাজেই তাঁহার সহিত অন্য কাহারও তুলনা হয় না।

রাম সীতা ও লক্ষ্মণ বনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া ক্রমে শৃঙ্গবের-পুরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের আগমনবার্তা অগ্রেই জানিতে পারিয়া তথাকার ব্যাধরাজ গুহক অগ্রসর হইয়া তাঁহাদিগকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। এই ব্যাধ পরমভক্ত এবং যথার্থ কর্মযোগী। ইতঃপূর্বে যে গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের "স্বে স্বে কর্মনি" ইত্যাদি কর্মযোগের শ্লোকগুলি উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে—এই গুহক, ভাগবতের ধর্মব্যাধ এবং রামায়ণের শবরী শ্রমণা সেই কর্মযোগ সাধকের জাজ্জ্বল্যমান্ দৃষ্টান্ত। এই ব্যাধ পশু শিকার করিয়া, মাংস বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। ইহাই তাহার স্বধর্ম বা সহজকর্ম। অন্যের পক্ষে ইহা অতি নীচ ও ঘৃণিত মনে হইতে পারে কিন্তু গুহকের উহা স্বভাবজাতকর্ম। ঐ কর্মই যদি নিষ্কামভাবে ও কর্তৃত্বজ্ঞান শূন্যভাবে ভগবানের

প্রীতির উদ্দেশ্যে করে এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তি বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহাতে পূর্ণ নির্ভরতা প্রকাশ পায়, তবে সে চণ্ডাল বা কসাই ক্রমশঃ কর্মযোগে সিদ্ধ হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার না পাইবে কেন? ভগবান্ কি কেবল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কেই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :—

মাং হি পার্থ! ব্যাপ শ্রিত্য যেঽপিস্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রা স্তেঽপি যান্তি পরাং গতিং ॥

গীতা ৯।৩২

অর্থাৎ পূর্ব জন্মের পাপবশতঃ স্ত্রীলোকই হউক, অথবা বৈশ্য বা শূদ্রই হউক, আমাকে ভজনা করিলে পরাগতি অর্থাৎ মুক্তি পাইতে পারে।

ভাগবতে ধর্মব্যাধের দৃষ্টান্তও ঠিক এইরূপ। ভগবানের নিকট সকলেই সমান। তাঁহার শত্রু মিত্র বা আত্মীয় পর কেহ নাই। তিনি গীতায় বলিয়াছেন :

সমোঽহং সর্বভুতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহং ॥

গী ৯।২৯

অর্থাৎ আমি সর্বজীবকে সমান দেখি, আমার কেহ শত্রু বা কেহ মিত্র নাই, যাঁহারা আমাকে ভক্তির সহিত ভজনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে অবস্থান করি। যে ব্যক্তি ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ভোগ্য

পদার্থ তুচ্ছমনে করিয়া সে সকলে অনাসক্ত হইয়া অনন্যচিত্তে পরমাত্মার ভজনে রত থাকেন এবং নিজ স্বাভাবিক কর্ম ভগবদর্পণ বুদ্ধিতে করিয়া যান, তিনি অতি নিকৃষ্ট জাতীয় বা অতি মূর্খ হইলেও ভগবানের প্রিয়। কথায় বলে, "মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে। শুচি হয়ে মুচি হয় যদি কৃষ্ণ ত্যজে॥" চতুর্দিক হইতে রাবণরাজার অনুচরগণের দ্বারা আসুরিক সাধনার জন্য প্রলুব্ধ এবং উৎপীড়িত হইয়াও গুহক ও তাঁহার অনুগত ব্যাধগণ ভগবন্মার্গ পরিত্যাগ করেন নাই। কাজেই তিনি এবং তাঁহার অনুচরগণ রামের নিকট ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অপেক্ষা প্রিয়তর। রাম পরমানন্দে তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তথায় তিন দিন অবস্থান করিলেন।

বিরাধ উদ্ধার

শৃঙ্গবেরপুর হইতে রাম লক্ষ্মণ ও সীতা ভরদ্বাজ-মুনির আশ্রম দর্শন করিয়া মহর্ষি অত্রির আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। অত্রির পত্নী পরম তপস্বিনী অনসূয়া তাঁহাদের পরম সমাদর করিলেন। তথা হইতে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়া ভয়ঙ্কর আসুরিক তপস্যার দ্বারা সিদ্ধ বিরাধ নামক উগ্রকর্মা অসুরের সম্মুখীন হইয়া তাঁহাদিগকে বিষম বিপন্ন হইতে হইল। এখন আসুরিক শক্তি কি প্রকার এবং অসুর শব্দের দ্বারা ভগবান্ গীতায় কাহাদিগকে বুঝাইতেছেন তাহার বিশদ আলোচনা আবশ্যক। গীতায় সপ্তম অধ্যায়ে প্রথম অসুর শব্দের উল্লেখ ভগবান করেছেন, যথা :—

ন মাং দুষ্কৃতনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥

গীতা ৭:১৫।

অর্থাৎ অসুর ভাবাপন্ন, নরাধম, মায়ার দ্বারা অপহৃত চিত্ত, দুষ্কৃতি পরায়ণ মোহগ্রস্ত ব্যক্তিগণ আমার শরণ গ্রহণ করে না। তৎপরে নবম অধ্যায়ে বলিয়াছেন :—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥
মোমাশা মোঘকর্মানো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥
মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥

গীতা ৯:১১—১৩

অর্থাৎ আমি যখন মনুষ্যদেহ ধারণ করি, তখন মোহগ্রস্ত ব্যক্তিগণ আমার ভূতমহেশ্বররূপ পরমভাব আছে, তাহা জানিতে না পারিয়া আমাকে অবজ্ঞা করে। তাহারা মোহনকারিনী রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাদের আশা কর্ম ও জ্ঞান নিষ্ফল এবং তাহারা বিপরীত বুদ্ধিযুক্ত অন্যপক্ষে দৈবপ্রকৃতি সম্পন্ন মহাত্মগণ আমাকে সর্বজীবের উৎপত্তিস্থান এবং অব্যয় জানিয়া অনন্যমনে আমার ভজনা করে।

এখন এই দুই অধ্যায়ের শ্লোকগুলি দ্বারাই ভগবান্ কাহাদিগকে অসুর বলিতেছেন, দেখিতে হইবে। ভগবানের বাক্যের তাৎপর্য এই যে, দৈব প্রকৃতি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ সুকৃতিশালী, মহাত্মা এবং অনন্যমনে ভগবদ্ভজন করেন এবং আসুরিক ও রাক্ষসী প্রকৃতি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ দুষ্কৃতিশালী, মোহগ্রস্ত, নরাধম, মায়াহৃতজ্ঞান তাহারা ভগবান্‌কে এবং তাঁহার নররূপে অবতারগণকে মানে না। ভগবান্ রাক্ষসী ও আসুরী দুইটী শব্দ এক সঙ্গেই ব্যবহার করিয়াছেন এবং গীতার অন্য কোথায় পৃথক্ ভাবে রাক্ষসী শব্দটী ব্যবহার করেন নাই। অতএব ঐ দুইটী প্রকৃতিই একার্থক বুঝিতে হইবে। এই শ্লোকগুলির সংক্ষিপ্তভাব এই যে দৈবপ্রকৃতি সম্পন্ন মানব ভগবান্‌কে মানে ও ভজনা করে কিন্তু আসুরিক ব্যক্তিগণ ভগবান্ মানে না, ভজনাও করেই না। এইবার ষোড়শ অধ্যায়ের সমস্তটীই কেবল দৈবী ও আসুরী প্রকৃতির পার্থক্য দেখাইবার জন্য। তাহাতে দেখি, দৈবী প্রকৃতি সম্পন্ন মানবের অভয়, সত্ত্বসংশুদ্ধি. জ্ঞানযোগে বিশেষ করিয়া অবস্থান, দান (সাত্ত্বিক), দম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপ (স্বাত্ত্বিক), সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, পৈশুন্যরাহিত্য, জীবে দয়া, আলোলুপত্ব, মৃদুতা, হ্রী, চাপল্যের অভাব, তেজ, ক্ষমা, সাত্ত্বিক ধৃতি, পবিত্রতা, দ্রোহাভাব ও অনভিমানিত্ব এই গুণগুলি পরিদৃষ্ট হয় এবং অসুর প্রকৃতি মানবগণের দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ ও পারুষ্য এই দোষগুলি থাকে। দৈবী প্রকৃতি মোক্ষের হেতু এবং আসুরিক প্রকৃতি বন্ধনের কারণ। আসুরিক ব্যক্তিগণ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির কোন স্তরই মানে না; তাহাদের পবিত্রতা, আচার সত্য কখন নাই, তাহারা বলে মিথ্যা ব্যতীত জগৎ চলিতে

পারে না এবং ঈশ্বর বলিয়া কেহই নাই। জীবের কর্মবশতঃ সদসদ্‌যোনি প্রাপ্তি, ইহা তাহারা মানে না, তাহাদের ধারণা স্ত্রী পুরুষের কামভোগের দ্বারাই জীবের উৎপত্তি হয়। এই দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া নষ্টাত্মা, অল্পবুদ্ধি অহিতকারী ব্যক্তিগণ জগতের ক্ষয়ের জন্য উগ্র কর্ম করিয়া থাকে। দুষ্পূরণীয় কামনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দম্ভ, মান ও দর্পযুক্ত হইয়া মোহবশতঃ অন্যায়ভাবে অর্থ উপার্জন করিয়া অপবিত্রভাবে জীবন যাপন করে। মৃত্যু পর্যন্ত অপরিমিত চিন্তায় জর্জরিত হয়, কামনার ভোগই তাহাদের পরম উপাদেয়। সহস্র সহস্র আশার বন্ধনে আবদ্ধ ও কাম ক্রোধ পরায়ণ হইয়া তাহারা অন্যায় ভাবে অর্থ সঞ্চয় করে। অদ্য এই পাইলাম, শীঘ্রই অন্য মনোরথ সিদ্ধ হইবে। এত টাকা করিয়াছি আবার কত টাকা করিব। এই মহাশত্রু নিপাত করিলাম, এইবার ক্ষুদ্র শত্রু কয়টাকে টিপিয়া মারিব। আমিই ঈশ্বর, ভোগী, সিদ্ধ, বলবান ও সুখী, আমিই ধনবান ও বন্ধুবান্ধব সকলেই আমার আজ্ঞাকারী। আমার মত কে পৃথিবীতে আছে? আমিই যজ্ঞ ও পূজা করিতে জানি, আমার মত দাতা কে, আমার মত আনন্দে কে আছে?—এই সমস্ত তাহারা বলে এবং নানা প্রকারে চিত্ত বিভ্রান্তির বশ হইয়া ও মোহজাল সমাবৃত হইয়া অপবিত্র নরকে পতিত হয়। তাহারা কাম, ক্রোধ ও লোভরূপ নরকের এই তিনটী দ্বার ব্যতিত সংসারে ভাল কিছুই জানে না। তাহারা উন্নত না হইয়া চিরকাল অধঃপতনের দিকেই অগ্রসর হয়। সপ্তদশ অধ্যায়ে ভগবান্‌ বলিয়াছেন ঃ—

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ॥
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃ শরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুর নিশ্চয়ান্॥

গীতা ১৭ অঃ ৫—৬

অর্থাৎ যে সমস্ত ব্যক্তি দম্ভ, অহঙ্কার সংযুক্ত হইয়া, কামনা, আসক্তি ও রাজসিক ও তামসিক বলাশ্রয়ে নিজের শরীরের মধ্যস্থিত জীবগণকে এবং অন্তঃকরণে অবস্থিত আমাকে কৃশ করিয়া অস্রশা বিহিত (অর্থাৎ বেদবিরোধী শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট) ঘোর তপস্যা করে তাহাদিগকে আসুরিক সিদ্ধান্ত বিশিষ্ট বলিয়া জানিও। এই সমস্ত শ্লোকে ভগবান্ অসুরদিগের সম্বন্ধে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে তাহার তাৎপর্য্য এই যে সত্ত্বগুণবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ গীতা ও উপনিষদাদি শাস্ত্রে বর্ণিত দেবগণ ও ভগবানের উপাসনা যথার্থ শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহিত করেন এবং তাঁহারা উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন। তাঁহারা দৈবীপ্রকৃতি সম্পন্ন। অসুর প্রকৃতি সম্পন্ন ব্যক্তিদের কেহ কেহ উগ্রতপস্যা করে। সে তপস্যার অতিঘোর ও তামসিক এবং তাহাদের সেই তপস্যায় বিধানকারী শাস্ত্র ও কুশাস্ত্র অর্থাৎ তাহা ঋষি প্রণীত নহে। তাহাতে উৎকট শক্তিসিদ্ধি লাভ হয় এবং সেই শক্তি দ্বারা তাহারা ত্রিভুবনের মহা অকল্যাণ সাধন করে। ইহাদের কেহ রজোগুণ, কেহ বা তমোগুণ প্রধান। সত্ত্বগুণ ইহাদের নাই বলিলেই চলে। ইতঃ পূর্বে যাহারা সাধনের নিম্নতম স্তরেও এখনও প্রবেশ করে নাই

বলিয়াছি ও যাহাদের সংখ্যা এখন পৃথিবীতে শতকরা ৮০ জন বলিয়াছি, তাহারা কোনরূপ শাস্ত্রই মানে না। রামায়ণ বর্ণিত আসুরী ও রাক্ষসী ব্যক্তিগণ ঘোর তপস্যা করে, তাহাদের তপস্যা রাজসিক ও তামসিক। গীতায় উক্ত আছে :—

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥
মূঢ়গ্রাহেনাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতং ॥

গী ১৭।১৮—১৯

অর্থাৎ অন্যের নিকট বাহবা, সম্মান ও পূজা পাইবার জন্য ধার্মিক সাজিয়া যে তপস্যা করা হয় তাহা রাজসিক, তাহার ফলের কোনও নিশ্চয়তা নাই। মোহবশতঃ নিজশরীরকে দারুণ যন্ত্রণা দিয়া শক্তি সিদ্ধির জন্য বা পরের সর্বনাশের জন্য যে তপস্যা করা হয় তাহা তামসিক। এই শ্রেণীর অসুরদের সমস্ত যাগ, যজ্ঞ, তপস্যা অসৎ শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট ও সমাজের অকল্যাণকারী।

এই কলিকালে অসুরপ্রকৃতির মানবের সংখ্যাই অধিক। শতকরা ৯০ বলিলেও চলে। যাহারা দেবতা, ভূত, প্রেতও মানে না তাহারা শতকরা ৮০ এবং ঐ সমস্ত মানিলেও যাহারা সাধনের দিকে যায় না, তাহারা বাকী শতকরা ১০। সত্ত্বগুণী দেব প্রকৃতি সম্পন্ন সাধক পৃথিবীতে শতকরা ১০ জনের বেশী নাই। আমরা অধিকাংশই অল্পবিস্তর অসুরভাবাপন্ন।

গীতায় ভগবান্ দৈত্য ও দানব শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন যথাঃ "প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং" অর্জুন বলিয়াছেন "ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ" এই দৈত্য ও দানবও অসুর শব্দবাচী, ইহাদের দ্বারা কেবলমাত্র দিতি ও দনুর পুত্রদিগকে ধরা হয় নাই। রাবণ, কংস, শিশুপাল প্রভৃতি সকলকেই পুরাণে দৈত্য ও দানব বলা হইয়াছে। এখন বিরাধের বিষয় আলোচনায় ফিরিয়া আসিতে হইবে। বিরাধাদি রাবণানুচর যে কাহারও উপাসনা করে না তাহা নহে। তাহারা শিব, শক্তি, ব্রহ্মা ইত্যাদি নাম দিয়া কতকগুলি উগ্রশক্তি আসুরিক প্রভাবযুক্ত ব্যক্তির আরাধনা করে। ঐ শিব, শক্তি ব্রহ্মাদি সাত্ত্বিকগণের উপাস্য শিব শক্তি ব্রহ্মাদি নহে, সাত্ত্বিকব্যক্তি ইঁহাদিগকে ভগবান্ বা তাঁহার বিভূতি বলিয়া উপাসনা করেন। আসুরিক ব্যক্তিগণ ঐ উন্নত নামের দেবতা বা ব্রহ্মবিভূতিকে স্বার্থপর, তোষামোদপ্রিয়, লম্পট, লোভী, ক্রোধী ইত্যাদিরূপে আরাধনা করিয়া তাঁহাদের নিকট নিজস্ব ভাবানুরূপ শক্তিসিদ্ধি লাভ করে এবং ভগবান্ই ঐ ঐ মূর্ত্তিতে তাহাদিগকে ঐরূপ শক্তিসিদ্ধি প্রদান করিয়া ক্রমশঃ দুঃখভোগ করাইয়া তাহাদের নির্বেদ আনয়ন করেন। পরে তাহারা ভগবদ্ভজনের যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়। পুরাণাদিতে এইরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এই বিরাধ ঐরূপ একটী জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। বিরাধ মহাশক্তিধারী ও তাহার শিষ্য প্রশিষ্যও অসংখ্য এবং তাহারাও প্রবল শক্তিশালী। বিরাধ ও তাহার শিষ্যগণের শক্তিসিদ্ধির অসারতা ও ঘৃণ্যতা প্রমাণ করিতে রামচন্দ্রকে বিশেষ বেগ পাইতে হইল। কাব্যে বর্ণিত আছে বিরাধ সীতাকে স্কন্ধে লইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

এখন রূপকের অর্থ এই যে, সে সর্ববিধ শক্তির অধিকারী হওয়াতে ব্রহ্মবিদ্যা তাহারই প্রাপ্য, রামের নহে, তাহা ধারণা করিল এবং নানাবিধ কূটতর্ক দ্বারা রামের যুক্তি খণ্ডন করিতে লাগিল। রামচন্দ্র তাহাকে পরাস্ত করিলেন বটে, কিন্তু এই সংগ্রামে জিগীষা উৎপন্ন হওয়ায় তাঁহার ব্রহ্মবিদ্যার উপর যেন একটু ছায়া পড়িয়া গেল। আসক্তি ও ক্রোধের উদয়ে তাঁহার ধ্যান ও সমাধিতে বিঘ্ন হইল। পূর্বের ন্যায় তন্ময় হইয়া ধ্যানস্থ থাকিতে কষ্ট পাইতে লাগিল। তথাপি তিনি নিজ উন্নত ভাব সর্বদা রক্ষা করিবার জন্য সতত যত্নশীল রহিলেন। বিরাধ নিজ সিদ্ধি শক্তির নীচত্ব ও অসারত্ব অনুভব করিয়া অতিশয় লজ্জিত হইল। সে রামচন্দ্রকে ভগবান্ জ্ঞানে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রদর্শিত সাধন পথে চলিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইল। তাহার শিষ্য প্রশিষ্য ও অনুচরগণ কিন্তু অনেকেই তাহার এই পরিবর্তনে দারুণ ক্রুদ্ধ হইল এবং তাহাকে পরিত্যাগ পূর্বক জনস্থানে মহাতেজা আসুরিকশক্তি সম্পন্ন খর, দূষণ ও সূর্পনখার নিকট প্রস্থান করিয়া নিজেদের সাধন পদ্ধতির ও সিদ্ধির সর্বনাশকারী রামের অধঃপতনের নানারূপ উপায় আবিষ্কারে মগ্ন হইল। অসুর মহলে মহা বিভীষিকা পড়িয়া গেল। রাবণরাজা এই সংবাদ অবগত হইয়া লঙ্কার ও সমস্ত দাক্ষিণাত্যে তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণকে আদেশ দিলেন, যেন সকলে মিলিয়া দণ্ডকারণ্য ও তৎসন্নিহিত স্থানে সমবেত হইয়া নিজেদের কঠোরতম উগ্রতপস্যা আচরণ করিয়া বিরোধাচরণকারী রাম ও তপোবনস্থ সমস্ত যোগী ঋষিদের সাধনে বিষম বাধা আনয়ন করে এবং নিজ নিজ আসুরিকশক্তি বর্দ্ধিত করিয়া সীতারূপিণী ব্রহ্মবিদ্যাকে

অপহরণ করিতে পারে। গীতায় ভগবান্ ঐ কঠোর উগ্র তপস্যা সম্বন্ধে বলিয়াছেন ঃ—

মূঢ়গ্রাহেনাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতং ॥ গী ১৭।১৯

অর্থাৎ নিজ দেহকে দারুণ যন্ত্রণা দিয়া পরের সর্বনাশ ও মৃত্যু ঘটাইবার জন্য মোহগ্রস্ত হইয়া যে তপস্যা করা হয় তাহা তামসিক তপস্যা। দণ্ডকারণ্যে ও জনস্থানে ঋষিগণ মহা বিপদে পতিত হইলেন। তাঁহারা রামচন্দ্রের আগমন জন্য উদগ্রীব হইয়া রহিলেন।

সূর্পণখার নির্য্যাতন

তৎপরে রামচন্দ্র জাবালি ও শরভঙ্গ ঋষির তপোবনে গমন করিলেন। তথায় ঋষিগণ রাবণানুচরগণ দ্বারা নানারূপ উৎপীড়িত হইয়াও নিজ নিজ সাধন পথে সুন্দর রূপে অগ্রসর হইয়াছেন দেখিয়া তিনি পরমানন্দিত হইলেন। শরভঙ্গ মুনি গীতোক্ত কর্মযোগ সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছেন। তিনি এখন স্থিতপ্রজ্ঞত্ব লাভ করিয়াছেন। তিনি দেবযান মার্গে সগুণ ব্রহ্মপ্রাপ্তির অধিকারী হইয়াছেন। রামচন্দ্রের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় তিনি দেহরক্ষা করিয়া রহিয়াছেন। গীতার অষ্টম অধ্যায়ের ৮।৯।১০ শ্লোকে বর্ণিত প্রণালীতে ধ্যানস্থ হইয়া তিনি ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। সে প্রণালী যথা ঃ –

অভ্যাস যোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা ।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥
কবিং পুরাণমনুশাসিতারমনোরণীয়ংসমনুস্মরেদ্‌য ঃ ।
সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ।।
প্রয়াণ কালে মনসাঽচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব ।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণ মাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥

গী ৮।৮—১০

অর্থাৎ অভ্যাস যোগে অনন্যমনে দিব্য পরম পুরুষকে চিন্তা করিয়া তাঁহার নিকট গমন করেন। যে সাধক সর্বজ্ঞ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, জগতের শাসক, অনু অপেক্ষা সূক্ষ্ম, সকলের বিধাতা, অচিন্ত্য-রূপবান্, জ্যোতির্ময়, গুণাতীত সগুণব্রহ্ম (ভগবান্)কে মৃত্যুর সময়ে অচল মনে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে প্রাণকে স্থাপন করিয়া ভক্তিযুক্ত হইয়া এবং যোগের সাহায্যে চিন্তা করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করেন, তিনি দিব্য পরম পুরুষের (ঈশ্বরের) নিকট গমন করেন।

তাঁহার প্রয়াণ ও রামসীতাকে দর্শন করিতে তাঁহার তপোবনে অনেক ঋষির সমাগম হইয়াছিল। তাঁহারা রামচন্দ্রকে ভগবানের অবতার বলিয়া বুঝিতে পারিলেন এবং রাবণ ও তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যদের আসুরিক তপস্যার প্রভাব হইতে বনবাসী ঋষিগণকে পরিত্রাণ করিবার জন্য এবং অসুরগণের শক্তিসিদ্ধির অসারতা ও

ব্রহ্মবিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য তাঁহারা রামকে অনুরোধ করিলেন। ঐ সমস্ত আসুরিক তপস্যাকারীদের দৌরাত্ম্যে ও তাহাদের শক্তিসিদ্ধি দর্শন করিয়া নিরীহ ভগবদ্ভজন-কারিগণ সর্বদা সন্ত্রস্ত ও অনেকে বাধ্য হইয়া আসুরিক সাধন করিতেছেন এবং মোক্ষমার্গ হইতে বিভ্রষ্ট হইতেছেন। রামচন্দ্র মহর্ষিদের অনুরোধ শিরোধার্য্য করিয়া ক্রমে সুতীক্ষ্ণ ও অগস্ত্যমুনির আশ্রমে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পঞ্চবটী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পঞ্চবটীর সন্নিকটবর্তী জনস্থানে রাবণের সহোদরা সূর্পণখার আশ্রম। রাবণ যেরূপ উৎকট তপস্যা দ্বারা বিশিষ্ট শক্তি ও বিভূতি অর্জন করিয়াছেন, সূর্পণখাও প্রায় সেইরূপ শক্তিলাভ করিয়া বিশিষ্ট ক্ষমতাশালিনী। তাঁহার শিষ্য ও অনুচরদ্বারা জন-স্থানপূর্ণ। সূর্পণখা শুনিলেন যে, তাঁহারই আশ্রমের অনতিদূরে, পঞ্চবটী বনে সীতারূপিনী ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণ আসিতেছেন। তিনি ও তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ তাঁহাদের সিদ্ধি-শক্তি ব্রহ্মবিদ্যা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য এবং রামলক্ষ্মণকে নিজেদের শক্তিদ্বারা মুগ্ধ করিয়া তাঁহাদের উপর পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করিবার জন্য, তাঁহাদের পঞ্চবটীতে আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র পঞ্চবটীতে আসিয়া দেখিলেন, সেই স্থান সাধনের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত। তথায় অনেক মুনিঋষি এবং অনেক সাত্ত্বিক সাধক বহুদিন হইতে সাধন ভজন করিতেছেন। তিনি তথায় কুটীর নির্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ঐ স্থানের মুনিগণ কিছুদিন পূর্ব হইতে দারুণ আসুরিক প্রকৃতি সম্পন্না সূর্পণখা ও তাঁহার রাক্ষসপ্রকৃতিসম্পন্ন অনুচরগণ দ্বারা উৎপীড়িত

হইতেছিলেন। কোন কোন নিম্নশ্রেণীর সাধক তাঁহাদের বিচিত্র আস্থুরিক শক্তি ও বিভূতি দেখিয়া রাজসিক ও তামসিক তপস্থার দিকে আকৃষ্ট হইতে ছিলেন। উচ্চশ্রেণীর তিতিক্ষাশীল এবং লোভবর্জ্জিত ঋষিগণ ভগবান্ ও দেবগণের সাহায্য শীঘ্র পাওয়া যাইবে, ইহা আশা করিয়া সাগ্রহে ভগবদবতার রামচন্দ্রের আগমন প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন। এখন রামের আগমনে তাঁহাদের যেন মৃতদেহে প্রাণ আসিল। তাঁহারা পরমানন্দে সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এদিকে স্থূর্পণখা শুনিলেন যে রামচন্দ্র বনবাসী সমস্ত মুনিদিগকে অভয় দিয়াছেন এবং তাঁহার নিজের মতাবলম্বী বহু আস্থুরিক তপস্বীকেও বেদোক্তমার্গে সাধনে পরিচালিত করিতেছেন এবং আস্থুরিক সাধননাশ করিবার উদ্দেশ্যে সকাম রাজসিক তপস্থার নানাবিধ দোষ প্রদর্শন করিয়া চতুঃপার্শ্বস্থ সমস্ত স্থানে কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন, তখন তিনি তাঁহার সমস্ত অনুচর ও ভক্তগণকে নানা মায়াজাল বিস্তার করিয়া রামের উদ্দেশ্য পণ্ড করিয়া দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করিলেন। তাহারা পঞ্চবটী সংলগ্ন তপোবনে দারুণ তামসিক শক্তির প্রভাব বিস্তার করিল। কিন্তু কিছুতেই রামের ক্ষতি বা তাঁহার সাধনের বিঘ্ন করিতে সমর্থ না হইয়া স্থূর্পণখাকে নিবেদন করিল, তখন সেই ভীষণ মায়াবিণী স্বয়ং রামের ব্রাহ্মী স্থিতি নষ্ট করিয়া তাঁহাকে নিজ ক্রীতদাস করিবার জন্য পঞ্চবটীতে আসিলেন। তথায় নানা আস্থুরিক মায়াজাল বিস্তার করিয়া ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত করিলেন। তাঁহার ভীষণ মায়া ও বিভূতিতে বনবাসী ঋষিগণ সাধন পথে ভয়ানক বাধা প্রাপ্ত হইলেন এবং চিত্ত স্থৈর্য্য রক্ষা করা তাঁহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য

হইয়া উঠিল। সূর্পণখা রাজসিক ও তামসিক সমস্ত সিদ্ধি শক্তি প্রয়োগ করিয়া রামকে ব্রহ্মবিদ্যা হইতে অধঃপাতিত করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে পরাস্ত করিতে রামকে বিশেষ বেগ পাইতে হইল। কারণ বিরাধের সহিত সংগ্রামে তাঁহার চিত্ত ব্রহ্মভাব হইতে অনেকটা বিচ্যুত হইয়াছিল। তৎপরে কিছু দিন আবার মনোনাশ, তত্ত্বাভ্যাস ও বাসনাক্ষয়ের সাধনায় যদিও পূর্বভাব আনিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে ছিলেন, তথাপি নিজ ভাগবতী শক্তি ও সিদ্ধির দিকে আকৃষ্ট ও তাহাতে আসক্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এখন তাঁহার এইরূপ পতনের কারণ কি তাহা আলোচনা করা আবশ্যক।

কর্মযোগ সাধনের সময় সাধক সমস্ত ভোগ্য পদার্থে বা অণিমাদি সিদ্ধি শক্তিতে সম্পূর্ণ বীতরাগ হইয়া কেবল মাত্র চিত্তশুদ্ধি ও ভগবৎ প্রীতির উদ্দেশ্যে জপ ধ্যান ও স্বধর্ম পালনরূপ কর্ত্তব্য কর্মগুলি সম্পাদন করেন। ক্রমশঃ চিত্ত শুদ্ধি হইতে থাকে। অণিমাদি বিভূতি বা ঐশ্বর্য্যশক্তি কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষা না করিলেও ঐগুলি অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে অজ্ঞাতসারে তাঁহার ভিতর প্রবেশ করিতে থাকে। ঐ ভক্তিপূর্ণ কর্মযোগ সাধন করিয়া ঐ যোগে সিদ্ধ হইলে অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবেই তিনি ব্রহ্মতেজ প্রাপ্ত হন। পরে কর্মযোগে উত্তীর্ণ হইয়া জ্ঞানভূমিতে যতই অগ্রসর হন ততই ঐ ব্রহ্মতেজ ঘনীভূত হইয়া সাধককে মহা তেজস্বী করে কিন্তু ঐ শক্তিতে তাঁহারা আসক্ত হন না। ঐগুলি তাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা তাঁহারা জানিতেও পারেন না। যখন দারুণ প্রলোভন, কাম বা ক্রোধের উদ্দীপনের কারণ সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাঁহারা

অজ্ঞাতসারে ঐ ব্রহ্মতেজ প্রভাবে অনায়াসে তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া উত্তরোত্তর উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। রামচন্দ্রও ঐ ব্রহ্মতেজ নিজমধ্যে বর্ত্তমান আছে ও তাহার দ্বারা তিনি সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া মুক্তিপথে অগ্রসর হইতেছেন ইহা জানিতে না পারিয়া এতদিন অনাসক্ত ভাবে ব্রহ্মবিদ্যা ভোগ করিয়া আসিতে-ছিলেন ও সমাধিতে আনন্দ প্রাপ্ত হইতেছিলেন। বিরাধের সহিত সংগ্রামে ও পঞ্চবটীতে সূর্পণখার অনুচরগণের সহিত ও শেষে সূর্পণখার সহিত সংগ্রামে তাঁহার ব্রহ্মতেজের প্রতি আসক্তি উপস্থিত হইল। যাহাতে শত্রুকে পরাজিত করা যায় ও অধিকতর শক্তি সঞ্চয় হয়, সেই ইচ্ছার দ্বারা তাঁহার ব্রহ্মবিদ্যা ম্লান হইতে লাগিল। অতএব তত্ত্বাভ্যাস ও মনোনাশে বাধা পড়িল। এখন আর সীতারূপিনী ব্রহ্মবিদ্যায় মনের একাগ্রতা রাখা তাঁহার নিকট কষ্ট সাধ্য রোধ হইতে লাগিল। তিনি সূর্পণখাকে পরাস্ত করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং লক্ষ্মণকে সূর্পণখার নাসিকা কর্ণচ্ছেদ করিতে আদেশ দিলেন। এই ক্রোধ ব্রহ্মবিদ্যার পরম শত্রু। যেখানে কাম ক্রোধ ও লোভ, ব্রহ্মবিদ্যা তাহার নিকট থাকিতে পারে না। এই জন্য সাধক ও সিদ্ধ সর্বদা সতর্ক থাকেন পাছে ঐগুলি অজ্ঞাতসারে চিত্তে প্রবেশ করে। বিশ্বামিত্রকে ঐ সকল প্রবৃত্তি কঠোর তপস্যার দ্বারা দমন করিতে হইয়াছিল। তিনি রামকে ঐ শত্রুগুলি নাশের জন্য বহুবিধ প্রণালী বা অস্ত্র দিয়াছিলেন। কিন্তু ভগবান যখন দেহ পরিগ্রহ করেন, তখন তাঁহাকে অনেকটা জীবের মতই হইতে হয়, তাহা না হইলে মনুষ্যগণ তাঁহার নিকট অগ্রসর হইতে পারিবে কিরূপে? কিরূপে উন্নত সাধক এবং সিদ্ধও সর্বদা সাবধান না থাকিলে তাঁহার সিদ্ধির

ক্ষতি হয়, তাহা মানুষকে আচরণ দ্বারা উপদেশ দিবার জন্য তিনি যেন অজ্ঞাতসারে ব্রহ্মতেজের প্রতি আকৃষ্ট ও আসক্ত হইলেন। তাঁহার ব্রহ্মবিদ্যা মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন হইল। খর, দূষণ, ত্রিশিরা ও সহস্র সহস্র শিষ্য প্রশিষ্য সহ সূর্পনখা রামের হস্তে নির্য্যাতিত হইলেন বটে কিন্তু সূর্পণখা বুঝিতে পারিলেন যে রামের অজ্ঞাত সারে তাঁহার সীতারূপিনী ব্রহ্মবিদ্যা মায়াচ্ছন্ন হইয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাবণের ন্যায় শক্তিশালী সিদ্ধ বিশেষ চেষ্টা করিলে তাঁহার মায়াচ্ছন্না দুর্বলা ব্রহ্মবিদ্যা অপহরণ করিয়া রামকে পরাজিত করিয়া পৃথিবীতে আসুরিক শক্তি প্রচারের বাধা অপসারিত করিতে পারিবেন। সূর্পণখা নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধি ও বৈর নির্য্যাতন জন্য রাবণের নিকট যাইতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার শিষ্য ও অনুচরগণ তাহাদের অজেয় গুরুর ঐ ভয়ঙ্কর পরাজয় ও অপমানে বিভ্রান্ত হইয়া জনস্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। পঞ্চবটী, দণ্ডকারণ্য ও জনস্থানবাসী ঋষিগণ রামের এই অসুর দমন কার্য্যে বিশেষ প্রীত ও আশ্বস্ত হইলেন। তাঁহারা রামকে মহা সমাদরের সহিত তাঁহাদের নিকট বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। রাম তাঁহার ব্রহ্মবিদ্যা ম্লান হইয়াছে অনুভব করিয়া সাধনদ্বারা উহা উজ্জ্বল করিতে তৎপর হইলেন।

মায়াসীতা হরণ

বিরাধের সহিত সংগ্রামের সময় হইতে রামের হৃদয়ে ব্রহ্মতেজ যাহাতে বর্দ্ধিত হয় ও তদ্দ্বারা যাহাতে তিনি আসুরিক শক্তি সিদ্ধির উপর বিজয় লাভ করিতে সমর্থ হন এই আসক্তি ও বাসনা উপস্থিত

হইয়া তাঁহার ব্রহ্মবিদ্যা ম্লান করিতেছিল। ক্রমে সুর্পণখার অনুচরগণের আসুরিক তেজ খর্ব করিতে তাহা আরও মলিন হইল। পরিশেষে স্বয়ং মহা মায়াবিনী সুর্পণখার মায়াজাল ও কুতর্কজাল খণ্ডন করিবার সময় তাঁহার দারুণ ক্রোধের সঞ্চার হওয়াতে মনোনাশ ও বাসনা ক্ষয় কার্য্যে বিষম বাধা উপস্থিত ত হইলই বটে অধিকন্তু তাঁহাকে জ্ঞানভূমির চতুর্থীভূমি অর্থাৎ সত্তাপত্তি হইতে পতিত হইতে হইল অর্থাৎ তাঁহার ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভের সাধন সমাধি হইতে তিনি মনের একাগ্রতার অভাবে ভ্রষ্ট হইলেন এবং তাঁহার অজ্ঞাতসারে সীতারূপিনী ব্রহ্মবিদ্যা অগ্নিরূপী পরব্রহ্মে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার নিকট কেবল ব্রহ্মবিদ্যার ছায়া বা মায়া সীতা। তিনি প্রাণপণ সাধনা করিয়াও মনের তরঙ্গরোধ করিতে সমর্থ হইলেন না। ধ্যানের অভাবে সমাধি হওয়া দুস্কর হইয়া উঠিল। তুলসীদাসের রামায়ণে বর্ণিত আছে এই সময়ে লক্ষ্মণেরও অজ্ঞাতসারে রামচন্দ্র সীতাকে অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া আত্মসংবরণ করিতে আদেশ দিয়া সীতার ছায়ামূর্তি নিজের নিকট রাখিলেন। কিন্তু জানিয়া শুনিয়া সীতাকে লুকাইয়া রাখিয়া তাঁহার বিরহে কাঁদিয়া আকুল হইয়া বনে বনে অন্বেষণ করিয়া শেষে তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত লঙ্কায় গিয়া রাবণকে বধ করা ইহা বড়ই অসামঞ্জস্যপূর্ণ। বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস কাব্যে যথার্থই সীতা অপহৃত হইয়াছে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। বাল্মীকি কাব্যে ইহা দেখাইলেও উন্নতবুদ্ধি ব্যক্তিদের বিচারের জন্য ইহার সূক্ষ্মতত্ত্ব গূঢ় ভাবেই রাখিয়াছেন। তিনি জানিতেন যে আসুরিক শক্তির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াও কোনও অসুর ভগবদ্ভক্ত বা কর্মযোগ সিদ্ধ ব্যক্তিরও সাধন পথে বাধা দিতে সমর্থ হয় না।

ব্রহ্মবিদ্যা অপহরণ ত দূরের কথা। ব্রহ্মবিদ্যার ত্রিসীমানার মধ্যে আসুরিক শক্তির প্রবেশাধিকার নাই। দৈবীশক্তির দ্বারাই আসুরিক শক্তির পূর্ণ পরাভব সম্ভবপর। ব্রহ্মশক্তি দৈবীশক্তির বহু ঊর্দ্ধে।

ভগবান্ রামচন্দ্র তাঁহার অবতারের উদ্দেশ্য যোগস্থ হইয়া জানিতে পারিতেন বটে, কিন্তু যদি তিনি বাহিরে মানুষের মত কিছু কিছু ভ্রান্ত না হন, তাহা হইলে লীলা চলে না, সেই জন্য যেন তাঁহার অজ্ঞাতসারেই সীতারূপিণী ব্রহ্মবিদ্যা অগ্নিরূপী পরব্রহ্মে লীন হইলেন। বাহিরে রামের নিকট রহিলেন মায়াসীতা বা মায়াদ্বারা আচ্ছাদিতা ম্লান ব্রহ্মবিদ্যা। এদিকে লঙ্কার রাবণ রাজার নিকট অকম্পন নামক সূর্পণখার এক শিষ্য গিয়া সংবাদ দিল যে রামচন্দ্র ব্রহ্মবিদ্যার প্রভাবে তাঁহার প্রিয় ভগিণী ও শিষ্যগণের শীর্ষস্থানীয়া সূর্পণখা ও তাঁহার শিষ্য ও অনুচরগণের সমুদয় মায়াজাল খণ্ডিত করিয়া তাঁহাদের সিদ্ধি শক্তির তেজ নষ্ট করিয়া দিয়াছেন এবং সূর্পণখার নাসা ও কর্ণ পর্য্যন্ত ছেদ করিয়া পৃথিবীর সমস্ত অসুরের ও রাবণ রাজার অপমানের চূড়ান্ত করিয়াছেন। এখন এই নিদারুণ অপমানের সমুচিত ফল যদি প্রদান না করা হয়, তাহা হইলে পৃথিবীতে তাহাদের মুখ দেখানই ভার হইবে এবং তাহাদের সমস্ত শক্তি সিদ্ধি লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হইবে। রাবণ রাজা এই সংবাদে দারুণ মর্মাহত হইলেন এবং কিরূপে এই ভয়ানক অপমানের প্রতিশোধ লওয়া যায় তাহার উপায় আবিষ্কার করিবার জন্য সমস্ত প্রধান শিষ্য ও তাঁহার নিজের গুরুকল্প ভীষণ মায়াবী মারীচের সহিত পরামর্শে প্রবৃত্ত হইলেন।

মারীচ রামচন্দ্রের ব্রহ্মবিদ্যার বল সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। তিনি জানিতেন তাঁহার বা তাঁহার সহধর্মীদের মুনিঋষি ও সাধারণ মানবের উপর যতই প্রভাব বিস্তারের শক্তি থাকুক না কেন, জনকাদি রাজর্ষিগণ ও রামচন্দ্রের মত ব্রহ্মবিদের নিকট তাঁহাদের সমস্ত শক্তিই পূর্ণভাবে পরাভূত হইবে। তিনি বিশেষ যুক্তি সহকারে রাবণকে রামের ব্রহ্মবিদ্যা হইতে দূরে থাকিবার পরামর্শ দিলেন এবং বিশিষ্ট অসুরগণও তাঁহার মত সমর্থন করিলেন। অগত্যা বাধ্য হইয়া রাবণকে রামের ব্রহ্মবিদ্যা হরণের সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত হইতে হইল। সূর্পণখা দারুণ পরাজিত ও নির্য্যাতিত হওয়ার পর রোষে এবং ক্ষোভে কাহাকেও মুখ না দেখাইয়া লুকাইয়া ছিলেন। তিঁনি যখন শুনিলেন তাঁহার ভ্রাতা এবং গুরু তাঁহার এই অপমানের প্রতিশোধ অসাধ্য মনে করিয়া মারীচের উপদেশে নিজ সঙ্কল্প সিদ্ধি বিষয়ে হতাশ হইয়াছেন, তখন তিনি আর লুকাইয়া থাকিতে পারিলেন না। স্বয়ং লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া নিজের অবস্থা রাবণকে দেখাইলেন এবং বলিলেন. "আমার সহিত কঠিন সংগ্রামে রামের ব্রহ্মবিদ্যা পূর্ণভাবে ম্লান হইয়াছে, এখন যে কোনও শক্তিশালী অসুর নিজশক্তি দ্বারা রামকে পরাজিত করিয়া তাহার ব্রহ্মবিদ্যা অপহরণ করিতে পারিবে, আপনার মত অসুরশ্রেষ্ঠের পক্ষে ইহা অতি সুসাধ্য, ইহা যদি না করেন, তাহা হইলে সমস্ত অসুরদল সমুদ্রে প্রবেশ করুন। এই মহা অপমান সহ্য করিয়া জীবন ধারণ করা অপেক্ষা মৃত্যু শতগুণে শ্রেয়ঃ"। তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া রাবণ ক্রোধে ও লোভে অধীর হইয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ মারীচকে আজ্ঞা দিলেন, যেন তিনি ও তাঁহার শ্রেষ্ঠ

শিষ্যগণ সহ তাঁহার সঙ্গে যাইয়া রামের ব্রহ্মবিদ্যা হরণ করিতে অনতিবিলম্বে তাঁহার সাহায্য করেন। ম্লানভাবাপন্না ব্রহ্মবিদ্যাকে রক্ষা করিতে রামের এখন আর সাধ্য নাই। তখন দুইজন মহা-শক্তিশালী অসুরই নিজ অনুচরগণসহ পঞ্চবটীতে গিয়া আসুরিক শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া রামকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার ম্লান ভাবাপন্না ব্রহ্মবিদ্যা বা মায়া সীতা হরণ করিলেন। কিন্তু তাহা ব্রহ্মবিদ্যার ছায়া, তাহাও আয়ত্ত্ব করা আসুরিক শক্তির পক্ষে অসম্ভব। রামচন্দ্র সীতা বা ব্রহ্মবিদ্যার সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইলেন বটে, কিন্তু রাবণের নিকট তিনি অগ্নিতুল্য ভয়ানক তেজস্বিনী। তিনি তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর হইতেও পারিলেন না। নামে তাঁহার অধীন হইলেও ছায়া ব্রহ্মবিদ্যা বা মায়াসীতা তাঁহার দুরধিগম্যা। নানা কৃচ্ছ্রসাধন ও ঘোর তপস্যা দ্বারা রাবণ সেই ব্রহ্মবিদ্যাকে প্রসন্ন করিয়া আয়ত্ত্ব করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই তিনি সিদ্ধকাম হইতে সমর্থ হইলেন না। শেষে তিনি নিরাশ হইয়া কেবলমাত্র বৈরনির্য্যাতন করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই সান্ত্বনা লাভ করিলেন।

শ্রমণা শবরীর ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি

রামচন্দ্র ব্রহ্মবিদ্যারূপিনী সীতার অগ্নিরূপী পরব্রহ্মে প্রবেশের পর হইতে নিজ অধঃপতন অনুভব করিতে লাগিলেন। মায়াচ্ছন্না ব্রহ্মবিদ্যা বা মায়াসীতা তখন তাঁহার নিকট বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু রাবণের সহিত ভীষণ সংগ্রামে তাঁহার মায়াচ্ছন্না ব্রহ্মবিদ্যা তাঁহাকে

বিশেষ সাহায্য করিতে পারিলেন না। তিনি রাবণের নানা ঐশ্বর্য্য ও বিভূতির নিকট পরাজিত হইলেন। তাঁহার শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা ও সমাধানেও ত্রুটী হইল। ধ্যান ও সমাধি তো বিরাধের সহিত সংগ্রামের পর অন্তর্হিত হইয়াছে। তিনি সীতারূপিনী ব্রহ্মবিদ্যা হারাইয়া প্রায় সাধারণ জীবের ন্যায় ব্যাকুল হইলেন। কি করিয়া আবার সীতার সন্ধান পাওয়া যায়, তাহার জন্য উপযুক্ত পথিপ্রদর্শক লাভের জন্য বনে বনে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণরূপী সত্ত্বাশ্রিত রজোগুণ এখন তাঁহার কোন সাহায্য করিতে পারিল না। তিনি লক্ষ্মণকে লইয়া সহায়ক লাভের আশায় ঘুরিতে ঘুরিতে কবন্ধ নামক মহা আসুরিক শক্তিশালী তপস্বী ও তাঁহার শক্তিশালিনী পত্নীর কবলে পতিত হইলেন। তখন তাঁহার ঐশী শক্তি বা ব্রহ্মবিদ্যা নাই বটে, কিন্তু তাঁহার লোকোত্তর চরিত্র ও তেজের দ্বারা কবন্ধ ও তাঁহার পত্নী তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিলেন না। তাঁহারা তাঁহার অনুপম দিব্যতেজে অভিভূত হইয়া তাঁহার চরণে আত্ম নিবেদন করিলেন এবং তাঁহার নিকট ভাগবতী দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কর্মযোগে মন নিবেশিত করিলেন। তাঁহারা রামের ব্রহ্মবিদ্যারূপিনী সীতার পুনরুদ্ধারের জন্য ঋষ্যমূক পর্বতে সুগ্রীব নামক ঋষিবরের আশ্রমে গমন করিতে রামকে অনুরোধ করিয়া বলিলেন "এই সুগ্রীব ও তাঁহার অনুচর যোগিগণ আপনার ব্রহ্মবিদ্যা পুনরুদ্ধারের বিশেষ সাহায্য করিতে পারিবেন। তিনি নিজে তাহার সতীর্থ বালী নামক যোগীর তপোবনে বাস করিতেন। এই বালী মহা উন্নত ছিলেন এজন্য তিনি তাহাদের গুরুর মৃত্যুর পর তত্রত্য সমস্ত যোগীর উপর প্রভাব সম্পন্ন হইয়া তথাকার মণ্ডলেশ্বরত্ব প্রাপ্ত

হন। কিন্তু কিছুদিন যাইতে না যাইতে তাঁহার তপঃসিদ্ধিতে আসক্তি ও দর্প উপস্থিত হইল। তিনি ঐশ্বর্য্য প্রতিপত্তি ও ভোগে লিপ্ত হইলেন। তিনি তাঁহার অনুগত ঋষিগণকেও অধঃপতনের দিকে লইয়া যাইতেছেন দেখিয়া মহাসাধক সুগ্রীব কয়েকজন বিশিষ্ট তেজস্বী যোগীকে লইয়া বালীর নিকট হইতে দূরে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে নিজেদের আশ্রম স্থাপন করিয়া বালী ও তাহার অনুগত যোগিগণের পরিণাম চিন্তায় কাতর হইয়াছেন। আপনার সাহায্যে বালীর উদ্ধার হইলে সুগ্রীব আপনার সীতার উদ্ধারে বিশিষ্ট সাহায্য করিতে পারিবেন। আপনার ব্রহ্মবিদ্যা অপহৃত হইয়াছে শুনিয়া তিনি ও তাহার আশ্রমের যোগিগণ বিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন। যাহাতে ব্রহ্মবিদ্যার পুনরাবির্ভাব হয় ও চারিদিকে ব্যাপ্ত ঘোর আসুরিকতার দমন হয় তিনি সে বিষয়ে আপনার বিশেষ সাহায্য করিবেন।”
রাম ও লক্ষ্মণ তাহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া ঋষ্যমূক পর্ব্বতাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পথে পম্পাসরোবরের তীরে এক পরম পবিত্র তপোবন দর্শন করিয়া পুলকিত হইলেন এবং তথায় উপস্থিত হইবামাত্র শ্রমণা নাম্নী তপস্বিনী শবরী তাঁহাদিগকে পরম ভক্তিভরে নিজ আশ্রমে লইয়া গেলেন। এই শ্রমণা জাতিতে অতি নীচ হইলেও পূর্ব পূর্ব জন্মার্জিত কঠোর তপস্যায় বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছেন। তিনি পূর্বজন্মে কোন অন্যায় কার্য্যের জন্য যোগভ্রষ্টা হইয়াছিলেন। এই জন্মে বাল্যকাল হইতেই তাহার চিত্তে ভগবদ্ভাবের স্ফুরণ হয়। মহাতেজস্বী গুরুও ভগবান মিলাইয়া দিলেন। কর্মযোগ সাধন সমাপ্ত করিয়া সাধনচতুষ্টয় সম্পন্ন হইতে তাঁহার বেশীদিন লাগিল না। তিনি গীতার ষষ্ঠাধ্যায়োক্ত সগুণ ব্রহ্মধ্যানে আত্মদর্শন

লাভ করিয়াছেন, তিনি বুঝিয়াছিলেন ভগবান রামরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া মানুষকে অসুরদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়া কর্মযোগ ও ব্রহ্মযোগ সাধনায় পুনঃপ্রবৃত্ত করাইবেন। তাঁহার দর্শন লাভের জন্যই তিনি এতদিন দেহরক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার গুরুদেবও রামকে ব্রহ্মবিদ্যা পুনরুদ্ধারের সাহায্য করিয়া ও তাঁহাকে দর্শন করিয়া তৎপরে ধ্যানস্থ হইয়া তাহাকে দেহত্যাগ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। শ্রমণা পরম ভক্তিভরে রামলক্ষ্মণের আতিথ্য সৎকার করিলেন এবং তিন দিন তাঁহার আশ্রমে বাস করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি রামকে ঋষ্যমূক পর্বতে গমন করিয়া সুগ্রীব ও তাঁহার অনুগত যোগিগণের সাহায্যে তাঁহার লুপ্ত ব্রহ্মবিদ্যা পুনরুদ্ধার করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন এবং ঋষ্যমূক পর্বতের সন্ধান বলিয়া দিলেন। চতুর্থ দিনে রামলক্ষ্মণের সম্মুখে যোগাসন স্থাপিত করিয়া তাহাতে উপবেশন পূর্বক অবিচল মনে ভ্রূদ্বয় মধ্যে প্রাণশক্তিকে উত্তোলন করিয়া পরম ভক্তি ও প্রত্যাহার, ধারণা ও ধ্যানের সাহায্যে ভগবচ্চিন্তন ও প্রণব উচ্চারণ করিতে করিতে সুষুম্না মার্গে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া অর্চ্চিরাদি শুক্ল মার্গে ব্রহ্মলোকে উপনীত হইলেন। দিব্য জ্যোতিতে তপোবন আলোকিত হইল। রাম লক্ষ্মণ আনন্দে আত্মহারা হইয়া তাঁহার দিব্য প্রয়াণ দর্শন করিলেন। তাঁহার মুক্তি দর্শনার্থী ঋষিগণ রামচন্দ্রকে ভগবানের অবতার বলিয়া জানিতে পারিয়া ও তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া শ্রমণা এতদিন দেহরক্ষা করিয়াছিলেন, ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহাদিগকে ঐ আশ্রমে কিছুদিন রাখিয়া তাঁহার সাধন কার্য্যে সাহায্য করিলেন। পরে সুগ্রীব ও তাঁহার আশ্রমের ঋষিগণের

সাহায্য জন্য উদ্‌গ্রীব রামকে নিতান্ত অনিচ্ছা সহকারে ঋষ্যমূক পর্বতের দিকে যাইবার জন্য বিদায় দিলেন।

সুগ্রীবের সহিত মিলন ও বালীর সুমতি

এখন কিষ্কিন্ধ্যার সুগ্রীবাদি ও বালীর সম্বন্ধে কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। কাব্যের ভাষায় ইঁহাদিগকে বানর বলা হইয়াছে ও রামচন্দ্রের সাহায্যের জন্য ইন্দ্রাদি দেবগণের অংশ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে। কাব্যে এই আশ্চর্য্য অসাধারণ ব্যাপার বর্ণনা না থাকিলে প্রাকৃত জনগণের মনঃ আকর্ষণ করা যায় না। হনুমানের পঞ্চান্ন যোজন লেজ, ঐ লেজের দ্বারা রামকে রক্ষার জন্য প্রাচীর করা, একলাফে সমুদ্র লঙ্ঘন, গন্ধ-মাদন পর্বত মস্তকে লইয়া আসা, সূর্য্যকে বগলে লইয়া ভরতের নিক্ষিপ্ত আশীলক্ষমণ বাঁটুল খাইয়া একটুও কাতর না হওয়া, বানর হইয়া সুপরিশুদ্ধ ভাষায় মানুষের সহিত কথা কহা, ঘরবাড়ী প্রস্তুত করা, রাজ্যশাসন করা, ইত্যাদি সাধারণ লোককে বড়ই কৌতূহল-পূর্ণ করে। কিন্তু ঋষির প্রণীত কাব্যে সাধারণ কবিদের ন্যায় প্রাকৃত লোকের চিত্ত বিনোদ জন্যই নহে। সাধারণ লোক এইরূপ মনোহারী গল্প না হইলে পড়িতে চাহে না এবং ঐ সমস্ত কৌতূহল-পূর্ণ গল্পের মধ্যে সুকৌশলে তাহাদের চরিত্রের উন্নতির জন্য ঋষিগণ ভগবদ্‌ভক্তি ও কর্মযোগের প্রণালীগুলি তাহাদের সম্মুখে স্থাপন করেন। উন্নত অধিকারের ব্যক্তিগণ এই সকলের প্রকৃত আধ্যাত্মিক

ভাবগ্রহণ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানে উন্নত হইতে বিশিষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হন, ইহা প্রথমেই বর্ণিত হইয়াছে। রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যার তৎকালীন অধিবাসী মাত্রকেই বানর বলা হইয়াছে। তথায় মনুষ্যের বাস ছিল না। বানরগণই নগর নির্মাণ করিয়া রাজ্যপালন, চিকিৎসার ব্যবস্থা, যুদ্ধবিগ্রহ, সংসার ধর্ম যথা বিবাহ, স্ত্রীপুত্র পালন, ধর্মকার্য্য ইত্যাদি মনুষ্যোচিত সমস্ত কর্মই করিত। কেবল কৃষি কার্য্যাদি কিছুই না করিয়া গাছে গাছে ফল ও মধুভক্ষণ করিত, ইহাই জানিতে পারা যায়। রামের সীতোদ্ধার ও রাবণ বধ জন্য দেবতাদের বানররূপে জন্মগ্রহণ রামায়ণে বর্ণিত আছে। তাঁহাদের জন্মের পূর্বে ভারতে বা তন্মধ্যবর্ত্তী কিষ্কিন্ধ্যা প্রদেশেও বানর জাতির অস্তিত্ব বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু মনুষ্যের মত উপরিলিখিত কোনও কার্য্যই তাহারা করিতে পারিত না। হঠাৎ এক প্রদেশে সেই জাতীয় বানরের কথাবার্ত্তা ও মনুষ্যোচিত সমস্ত কার্য্যাবলি দর্শন করিয়া কেহ যে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছে রামায়ণে তাহার কোন উল্লেখ নাই। দেবতাগণ রামের কার্য্যে সাহায্য করিতে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা খুব সম্ভব। কারণ ভগবান্ যখন ধরাধামে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁহার ধর্মস্থাপনের কার্য্যের সাহায্য করিবার জন্য স্বঃ, মহঃ, জন, তপ ও সত্যলোকের দেবগণ এবং ঈশ্বর, কোটীর জীবগণ তাঁহার সহিত অবতীর্ণ হন। এই বালী, সুগ্রীব, হনুমান প্রভৃতি ব্যক্তিগণ সেইরূপ দেবতাগণের অবতার, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। তাঁহারা পূর্বে মানুষ জন্মে বিশেষ উন্নত হইয়া স্বর্গ, মহঃ প্রভৃতি নিজ কর্মোচিত ধামে গমন করিয়াছিলেন। রামের অবতারের সময় কেহ বা পূর্বসাধনের পরিপক্কতার জন্য কেহ বা

সিদ্ধ হইয়াও ভগবৎকার্য্যের সাহায্যের জন্য স্বেচ্ছায় মানবরূপে কিষ্কিন্ধ্যায় যোগিবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিষ্কিন্ধ্যায় সকলেই যোগী ছিলেন না এবং তাহা সম্ভব নয়। ত্রেতাযুগে যেমন অন্যান্য সমাজে সর্বপ্রকার মানুষ থাকিত, কিষ্কিন্ধ্যাতেও সেইরূপ লোক বাস করিত। কিন্তু যোগী ঋষির সংখ্যা অন্যান্য স্থান হইতে এ প্রদেশে অধিক ছিল। কিষ্কিন্ধ্যার অন্তর্গত কোন আশ্রমে এই সমস্ত যোগিগণ সাধন ভজন করিতেন। বালী সেই স্থানের মণ্ডলেশ্বর ছিলেন। তাঁহার সাধনহীনতা জন্য সুগ্রীব বিশিষ্ট যোগিগণকে লইয়া ঋষ্যমূক পর্বতে আশ্রম স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহা কবন্ধের নিকট রামচন্দ্র অবগত হইয়াছিলেন। শ্রমণা প্রদর্শিত পথে ঋষ্যমূকের দিকে গমনের সময় হনুমানের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। এই হনুমান সুগ্রীবের আশ্রমে ঋষ্যমূকে বাস করিতেন। সুগ্রীবাদি ইতঃপূর্বে অবগত হইয়াছেন যে রামচন্দ্র তাঁহার লুপ্ত ব্রহ্মবিদ্যা পুনরুদ্ধারের জন্য তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করিতে তাঁহার আশ্রমে আসিতেছেন। সেইজন্য আশ্রমের শ্রেষ্ঠযোগী হনুমানকে রামচন্দ্রকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। এই হনুমানের সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। রামায়ণে লক্ষ্মণ বিভীষণ অপেক্ষাও হনুমান্ রামের বিশেষ হিতকারী ও প্রিয়। তিনিই সীতার উদ্ধারের জন্য সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন এবং যতদিন রাম পৃথিবীতে ছিলেন, তিনি ছায়ার ন্যায় তাঁহার নিকট ছিলেন। রাম ও সীতার পরই হনুমান্ রামায়ণের প্রধান চরিত্র। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে রামচন্দ্রের যত মন্দির আছে তদপেক্ষা হনুমান বা মহাবীরের মন্দিরের সংখ্যা অধিক। হনুমানজিকে

অনেক স্থলে লোকে রামের অপেক্ষা অধিক সম্মান করে। কিন্তু তথায়ও হনুমানকে পুচ্ছ ও বৃহৎ লোম বিশিষ্ট বানরেরই পূজা করা হয়। বাঙ্গালা দেশে লেজ ত আছেই বটে; তদপেক্ষা অত্যন্ত মূর্খকেই হনুমান্ বলিয়া গালি দেওয়া হয়। বাঙ্গালায় হনুমান্ নাম কেহ পুত্রের রাখে না। রামদাস রাখিলেও, তাহাকে লোকে হনুমান্ বলিয়া ব্যঙ্গ করে। কিষ্কিন্ধ্যার হনুমান মহাযোগী ছিলেন। পূর্ব পূর্ব জন্মে কর্মযোগে উন্নীত হইয়া সাধনচতুষ্টয় সম্পন্ন হইবার পূর্বেই দেহত্যাগ হওয়ায় ব্রহ্মলোকে গমন করিতে পারেন নাই। তাঁহার সে জন্মে ইন্দ্রিয়ভোগ্য পদার্থের প্রতি লালসার জন্য বা সাধনবিষয়ে শৈথিল্যের জন্য যোগভ্রংশ হয় নাই, সেইজন্য স্বর্গলোকে গমন করিয়া ইন্দ্রিয়সুখভোগের জন্য বহু কাল বাসও করিতে হয় নাই। তিনি গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের—

অথবা যোগিনামের কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্॥

গী ৬।৪২

এই ভগবদুক্তি অনুসারে পূর্ব জন্মের দেহত্যাগের পরই কিষ্কিন্ধ্যায় বিশিষ্ঠ যোগীর গৃহে জন্মলাভ করেন। বাল্যকালেই তিনি ইন্দ্রিয়ভোগে বীতশ্রদ্ধ হন। গীতায় আছে—

তত্র তং বুদ্ধি-সংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন॥

গী ৬।৪৩

অর্থাৎ সেই যোগ-ভ্রষ্ট সাধক সেই যোগিবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্বজন্মের সাধন দ্বারা উদ্ভূত ভগবানে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি প্রাপ্ত হন এবং পুনর্বার সম্যক্ সিদ্ধি প্রাপ্তির জন্য সেই জন্মে সাধনার পথে অগ্রসর হইতে থাকেন।

হনুমান্‌ও বাল্যকাল হইতে ভগবদ্ভাবে উন্নত হইতে থাকেন। অল্পদিন মধ্যে সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হইয়া তিনি ব্রাহ্মী দীক্ষা গ্রহণ করিয়া শুভেচ্ছাদি তিন জ্ঞানভূমিতে উন্নতি লাভ করিয়া সত্তাপত্তি-ভূমিতে ব্রহ্মদর্শন করেন। পূর্বে বলিয়াছি, লক্ষ্মণ ও বিভীষণের ন্যায় তিনি ব্রহ্মবিদ্যাকে মাতৃভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ব্রহ্মযোগ সাধনায় সিদ্ধ মহাত্মা হনুমান রামচন্দ্রকে দেখিয়াই ভগবদবতার বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং তিনি পৃথিবীতে ধর্মের গ্লানি নিবারণ করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া তাঁহার চরণে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া প্রভুর কার্য্য সাধনার জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে লইয়া ঋষ্যমূক পর্বতে সুগ্রীবের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। আশ্রম-বাসী সকলেই মহাসাদরে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহারা বিবিক্ত দেশে তাঁহার আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাহাতে সেখানে তাঁহার ধ্যান ও সমাধিতে কোন বিঘ্ন উপস্থিত না হয় তাহার সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তথায় কয়েকদিন পরবৈরাগ্য সহকারে দেহ মন ও বাক্য সংযম করিয়া ধ্যান যোগে রত থাকিয়া কামনা, ক্রোধ, দর্প এবং অহঙ্কার পরিহারপূর্বক মমত্ব রহিত হওয়াতে রামচন্দ্র আপনার ব্রহ্মবিদ্যার অন্তর্ধানের কারণ হৃদয়ঙ্গম করিলেন। তিনি বুঝিলেন যে তিনি সিদ্ধিশক্তিতে আসক্তি ও প্রতিষ্ঠার জন্য ও

পরমতের উপর বিজয়লাভ ইচ্ছা করিয়া ভ্রষ্ট হইয়াছেন। ঐ ত্রুটি সংশোধন জন্য এবং সমাধিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য কঠোর সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। মনোনাশ ও তত্ত্বাভ্যাসের ফলে তিনি ব্রহ্মবিদ্যা বা সীতার সন্ধান পাইলেন অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী সীতা যে রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃত হইতে পারেন না তিনি যে অগ্নিরূপী পরব্রহ্মে প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছেন, রাবণ কেবল বৃথা আস্ফালনই করিয়াছেন, ব্রহ্মবিদ্যার সন্ধান তিনি কিছুই পান নাই, কেবলমাত্র তিনি তাঁহার নিকট যে মায়ামূর্ত্তি বিদ্যমান্ ছিল অর্থাৎ তিনি ভ্রান্তিযুক্ত হইয়া যে অবিদ্যাকে বিদ্যা বলিয়া কিছুদিন ধারণা করিতেছিলেন, সেই ভ্রান্তির নিরাস করিয়া রাবণ তাঁহার উপকারই করিয়াছেন, কারণ ভ্রান্তিবশতঃ অবিদ্যা বশবর্ত্তী হইয়া তিনি উত্তরোত্তর অধোগতিই প্রাপ্ত হইতেন যথার্থ বিদ্যা পাইবার চেষ্টা করিতে পারিতেন না। তিনি আরও বুঝিলেন, মায়াচ্ছন্না ব্রহ্মবিদ্যা যাহা রাবণ তাঁহার নিকট হইতে অপসৃত করিয়াছেন, তাহাও আয়ত্ত করা রাবণের ন্যায় আসুরিক প্রকৃতিসম্পন্ন তপস্বীর একেবারে অসাধ্য। এই ব্রহ্মবিদ্যা বা সীতার সন্ধান পাইলেন, সাধক শ্রেষ্ঠ মহাত্মা হনুমানের সাহায্যে। কেহ মনে করিতে পারেন যে রামচন্দ্র ব্রহ্মবিদ্যা হারাইয়া তাঁহার সন্ধান পাইবার জন্য তাঁহার শিষ্যতুল্য এবং তাঁহাপেক্ষা নিকৃষ্ট সাধক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হনুমানের নিকট কিরূপে ব্রহ্মবিদ্যার সন্ধান পাইলেন—তিনি নিজে ব্রহ্মবিদ্যাকে স্বকীয়া শক্তিরূপে পাইবার অধিকারী হইয়াছেন—যাহা ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে নাম ও রূপ রাখিয়া কেহ পান নাই। তাঁহার কাহারও সাহায্যের আবশ্যকতা হইল কেন? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে অনেক সময় বিশিষ্ট মহাত্মাগণও

অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট ও এমন কি অতি নিকৃষ্ট জীব বা পশুপক্ষী দ্বারাও আপনার ভ্রান্তি নিরাসে সাহায্য পান। বিল্বমঙ্গল চিন্তামণি বেশ্যার নিকট, লালাবাবু মেছুনীর নিকট সাধন বিষয় সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং পুরাণাদিতে অবধূত প্রভৃতির উপাখ্যানে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আমি শিক্ষক, আমি কতবার আমার ছাত্রের নিকট আমার ভুল-ভ্রান্তির সন্ধান পাইয়া নিজেকে সংশোধন করিয়াছি। অতএব সাময়িক মোহগ্রস্ত রামচন্দ্র যে বিশিষ্ট সাধক হনুমানের সাহায্যে তাঁহার লুপ্ত ব্রহ্মবিদ্যার সন্ধান পাইলেন ইহাতে আশ্চার্য্যান্বিত হইবার কি আছে?—রামচন্দ্র ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী সীতার সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া বালীর আশ্রমে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহাকে নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা সুন্দররূপে বুঝাইয়াছিলেন, সাধককে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে থাকিবার সময় কিরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। তিনি দেখাইলেন যে কত বিশিষ্ট জ্ঞানী কঠোর সাধন ভজন সত্ত্বেও বলবান্ ইন্দ্রিয় ও মনের বশীভূত হইয়া অকস্মাৎ সাধনমার্গ হইতে স্খলিত হইয়া যান। ইন্দ্রিয় ও মনের উপর পূর্ণ আধিপত্য লাভ যতদিন না হয় ততদিন বিশেষ সতর্কভাবে উহাদের কর্ম ও চিন্তাগুলি সর্বদা পরীক্ষা করিতে হয়। সামান্য শৈথিল্য পাইলেই উহারা সাধকের সর্বনাশ সাধন করে। বালী ধীরে ধীরে কিরূপে পতিত হইয়াছেন ও হইতেছেন তাহা সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিলে বালী রামের নিকট অবনত মস্তকে তাহা স্বীকার করিলেন এবং তাঁহাকে ভগবানের অবতার জ্ঞানে তাঁহার দত্ত উপদেশ ও সাধন পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া সমস্ত ঐশ্বর্য্য ও প্রতিপত্তি তুচ্ছজ্ঞান করিয়া একান্তে

সাধন ভজন করিবার জন্য দূরবর্ত্তী অরণ্যে এক আশ্রম স্থাপন করিলেন এবং সন্ন্যাসীর মণ্ডলেশ্বরত্ব যে তাঁহার সকল সর্বনাশের মূল, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সুগ্রীবকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে মণ্ডলেশ্বর করিয়া যাহাতে তিনি ঐশ্বর্য্য ও প্রতিপত্তি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার মত পতিত না হন, সেইজন্য সর্বদা ভগবদবতার রামচন্দ্রের আদেশ পালন করিতে এবং ভক্তশ্রেষ্ঠ হনুমানের সাহায্য গ্রহণ করিতে উপদেশ দিলেন। রামচন্দ্র যে কার্য্যের জন্য অবতীর্ণ তাহা স্মরণ করিয়া যাহাতে সীতারূপিণী ব্রহ্মবিদ্যা পুনরুদ্ধার করিয়া পৃথিবী হইতে রাজসিক ও তামসিক শক্তি সিদ্ধির জন্য তপস্থার মূলোচ্ছেদ করিতে পারেন তাহা সাধন করিতে সমস্ত কিষ্কিন্ধ্যার যোগিগণকে লইয়া দাক্ষিণাত্য ও লঙ্কা নিবাসী অসুরগণের তপস্থা ও সিদ্ধিশক্তির হেয়তা ও নশ্বরতা প্রদর্শন করিবার জন্য দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রাবণের বুদ্ধিশুদ্ধি

রাবণ পঞ্চবটী বনে রামের সহিত সংগ্রামে যে সমস্ত মায়াজাল ও শক্তি বিস্তার করিয়াছিলেন, ব্রহ্মবিদ্যা বা সীতা সঙ্গ হইতে বিচ্যুত হওয়ায় রাম তাহা খণ্ডন করিবার শক্তি হারাইয়াছিলেন। উহাতে রাবণের ধারণা হইল রামের ব্রহ্মবিদ্যা তিনি হরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং উহা তাঁহার স্বকীয়া শক্তি হইয়াছে। তিনি জানিতেন না যাহাকে ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন তাহা ব্রহ্মবিদ্যার ছায়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। তিনি তাহাও আয়ত্ত

বা উপলব্ধি করিতে কিছুতেই সমর্থ হইলেন না। কত কৃচ্ছ্রসাধন ও কঠিন তপস্যা করিলেন, কিন্তু কোনও ফলোদয় হইল না। লঙ্কার লোকে বুঝিল রাবণ রামের সীতা বা ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু রাজসিক ও তামসিক তপস্যা দ্বারা আসুরিক শক্তি লাভ ভিন্ন দৈবী শক্তিই লাভ হয় না, তাহার কত উপরে ব্রহ্মবিদ্যার ছায়া? যথার্থ ব্রহ্মবিদ্যা ত একেবারে পূর্ণ অসম্ভব।

রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণের কথা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি পরম সাত্ত্বিক সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন। ব্রহ্মমার্গে প্রবেশ করিয়া তিনি চতুর্থীভূমিতে উপনীত হইয়া লক্ষ্মণ ও হনুমানের মত ব্রহ্মবিদ্যাকে মাতৃরূপে ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা উক্ত হইয়াছে। তিনি লঙ্কাদ্বীপে রাবণের নিকট হইতে বহুদূরে ব্রহ্মানন্দে মগ্ন থাকিতেন। লোকপরম্পরায় যখন শুনিলেন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাবণ রামের সীতা বা ব্রহ্মবিদ্যা হরণ করিয়া আনিয়াছেন, তখন তিনি কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি জানিয়াছিলেন, রামচন্দ্র স্বয়ং ভগবানের অবতার। তিনি জীব উদ্ধারের জন্য ধরা-ধামে অবতীর্ণ হইয়া লোককে শিক্ষা দিবার জন্য নিজে সাধনা করিয়া জনকরাজার নিকট ব্রহ্মবিদ্যাকে স্বকীয়া শক্তিরূপে পাইয়াছেন। পৃথিবীতে বা অন্য কোনও লোকে কাহারও সে শক্তি নাই যে, পৃথক সত্তা রক্ষা করিয়া তাঁহার মত ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী হয়। তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় ত নিতান্ত অসার ও ঘৃণিত আসুরিক সম্পদের মাত্র অধিকারী, ব্রহ্মবিদ্যার ছায়া স্পর্শ করিতেও তাঁহাদের শক্তিতে কুলাইবে না। তিনি রাবণকে অসুর প্রকৃতি হইতে নিস্তার করিবার জন্য বহুকাল চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন

কিন্তু কেবল অপমান মাত্র পাইয়াছিলেন। লোকের বাক্যে বিস্মিত হইয়া রাবণের সহিত সাক্ষাতে বুঝিলেন, রাবণের ও তাঁহার অনুচরগণের সহিত বহুদিন কঠিন সংগ্রামে রামের ব্রহ্মবিদ্যার সাময়িক অন্তর্দ্ধান হইয়াছে। তাঁহার মায়াচ্ছন্না ব্রহ্মবিদ্যাকে তাঁহার সঙ্গচ্যুত করিয়া রাবণ নিজে ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী হইয়াছেন বলিয়া বৃথা অভিমান করিতেছেন, কারণ আসুরিক প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি মনে করে আমিই ঈশ্বর, আমিই ভোগী, আমি সিদ্ধ, আমি বলবান্ ও আমি সুখী, আমিই ধনবান্ ও অভিজনবান্ আমার মত সংসারে কে আছে? তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভ্রম ও দাম্ভিকতা নিরাস করিবার জন্য কত বুঝাইলেন ও রামের বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ হইতে নিবৃত্ত হইতে ও তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া মাতৃরূপে যথার্থ ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতে অনুনয় করিলেন। তিনি যাহাকে ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়া মনে করিতেছেন তাহা ব্রহ্মবিদ্যার ছায়া মাত্র এবং ঐ ছায়াও রাবণের সীমার বহু ঊর্দ্ধে, ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। রাবণ তাঁহার সমস্ত উপদেশ অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করিলেন ও তাঁহাকে পদাঘাতে দূর করিয়া দিলেন।

বিভীষণ বিষণ্ণ চিত্তে তথা হইতে প্রস্থান করিয়া দাক্ষিণাত্যে রাম ও সুগ্রীবাদির নিকট যাত্রা করিলেন। রামের জীবোদ্ধার কার্য্যে ও তাঁহার ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী সীতার পুনরুদ্ধার কার্য্যে সাহায্য করিতে তাঁহার একান্ত বাসনা। রাম লক্ষ্মণ তাঁহাকে পরম আত্মীয় ভাবে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে লইয়া লঙ্কাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দাক্ষিণাত্যে রাবণের বহু শিষ্য ও অনুচর

ছিলেন, তাঁহারা অধিকাংশেই রামের ঐশী শক্তিতে পরাজিত হইয়া বৈদিক সাধনমার্গ অবলম্বন করিতে লাগিলেন। মহা আসুরিক প্রকৃতিসম্পন্ন কয়েকজন পলায়ন করিয়া রাবণ রাজাকে রামের প্রতাপ ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার রামের দাসত্ব গ্রহণের সংবাদ জ্ঞাপন করিল, রাবণ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া ভারতের মধ্যে তাঁহার প্রকৃষ্ট শিষ্যদিগকে লঙ্কায় ও দাক্ষিণাত্যে মিলিত হইয়া রামের ও তাহার অনুচরগণের কার্য্যের প্রতিশোধ ও প্রাণপণে আসুরিক শক্তির রক্ষার জন্য আদেশ দিলেন। সমগ্র ভারতের অসুর মহলে ভীষণ তোলপাড় আরম্ভ হইল। তাঁহারা দলে দলে দাক্ষিণাত্য ও লঙ্কা অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রের গমন পথে তাঁহারা মায়াজাল ও শক্তি বিস্তার করিয়া দারুণ বাধার সৃষ্টি করিলেন—মহাত্মা হনুমান্ ও লক্ষ্মণ ইহাদের সমস্ত মায়াজাল ছিন্ন করিয়া দিলেন—তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ রামচন্দ্রের অনুগত হইয়া ভগবদ্ভাবে সাধনের দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। অত্যন্ত আসুরিক প্রবৃত্তিসম্পন্ন বহু ব্যক্তি লঙ্কার রাবণের নিকট যাত্রা করিলেন ও নিজেদের পরাভবের সংবাদ রাবণকে দিলেন। লঙ্কা যাত্রার পথে রামচন্দ্র ঋষিগণের আশ্রমে তাঁহাদিগকে অভয় দিয়া ও তাঁহাদের আশ্রমে তাঁহাদের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া ক্রমে লঙ্কাদ্বীপে উপনীত হইলেন। লঙ্কাদ্বীপে রাবণের একাধিপত্য। সমুদ্র পার হইয়াই রাম ও তাঁহার অনুচরগণ বিষম বাধাপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। তত্রত্য রাবণের প্রজা ও শিষ্যগণ ঘোর তামসিক প্রকৃতির। তাহারা নানা অপবিত্র ও ঘৃণিত দ্রব্যাদি লইয়া রামচন্দ্র ও তাঁহার সঙ্গের যোগিগণের যোগ সাধনে বিঘ্ন উপস্থিত করিতে লাগিল। বিভীষণ

ও হনুমান্ তাহাদের প্রতি এমন সদয় ব্যবহার করিয়া স্নেহভরে তাহাদের উন্নতির জন্য উপদেশ দিতে লাগিলেন যে তাহারা আশ্চর্য্যান্বিত ও লজ্জিত হইয়া মাথা হেঁট করিল। ইঁহাদের ঐশী শক্তির তেজে তাহারা আপনাদের কুকর্ম জন্য অনুতাপ করিতে লাগিল ও যোগিগণের নিকট দীক্ষিত হইয়া ভগবদ্ভক্তি পথে মনোনিবেশ করিল। ক্রমশঃ রামচন্দ্র রাবণের রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। সেখানে রাবণের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ অসুর শিষ্যগণ উপস্থিত ছিলেন। তাহারা সাংখ্য ও পাতঞ্জলোক্ত যোগসিদ্ধির প্রভাবে দেবতাদের ত্রিভুবন পালন কার্য্যে বাধাদান, ভূমিকম্প ও ঘূর্ণিবাত্যা উৎপাদন এবং এমন কি সূর্য্য ও চন্দ্রের গতিরোধ করিতেও সমর্থ। তাঁহাদের শক্তি তাঁহারা পূর্ণভাবে প্রয়োগ করিতে লাগিলেন; পৃথিবীতে যেন প্রলয় উপস্থিত হইল। দেবতারা সমস্ত জীবের দুঃখ ও বিপদ দেখিয়া কাতর হইলেন কিন্তু রামচন্দ্র, হনুমান, লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও সুগ্রীবাদি সকলে প্রসন্নমনে সমাহিত চিত্তে, ক্রোধ ও অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের সমস্ত আসুরিক শক্তি দৈবী শক্তি দ্বারা পরাজিত করিলেন। রাবণের বিশিষ্ট বিশিষ্ট অনুচর তাঁহাদের তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া অন্যত্র পলায়ন করিলেন। অধিকাংশই রামের আনুগত্য স্বীকার করিয়া চিত্ত-শুদ্ধি জন্য ভগবদ্ভক্তির সহিত কর্মযোগ সাধন আরম্ভ করিলেন। কিন্তু রাবণ কিছুতেই নিজমার্গ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহার সমস্ত সিদ্ধিশক্তি পূর্ণরূপে প্রয়োগ করিলেন ও রাম ও তাঁহার অনুচরগণকে বিশেষভাবে বিব্রত করিয়া তুলিলেন।

কুম্ভকর্ণ তাঁহার সমস্ত আভিচারিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া রাম

বা তাঁহার অনুচরবর্গের কোনও ক্ষতি সাধন করিতে না পারিয়া হতাশ হইলেন এবং তামসিক সিদ্ধিশক্তি যে সত্ত্বগুণী সাধকের নিকট অতি তুচ্ছ বস্তু এবং তাহার দ্বারা মাত্র তমোগুণী লোককেই বশীভূত বা নিস্তেজ করিতে পারা যায় ইহা পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া নিজে যে এতদিন বৃথা ঐ সমস্ত সাধনে অমূল্য সময় নষ্ট করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিয়া রামের চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন এবং রাম তাঁহাকে এখন কর্মযোগের সাধন না দিয়া ভগবানের নাম জপ ও তাঁহার গুণকীর্ত্তনাদিরূপ গীতার নবম অধ্যায়োক্ত সুসাধ্য ভক্তিযোগে দীক্ষিত করিলেন। রাবণ তাঁহার ঐ কার্য্য দর্শনে তাঁহার প্রতি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন এবং রাজধানী হইতে তাঁহাকে দূর করিয়া দিলেন। এখন রাবণকে পরাজিত করা রামের অত্যন্ত দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। রামায়ণে বর্ণিত আছে ব্রহ্মাস্ত্র ভিন্ন রাবণ বধের উপায়ান্তর নাই। সেই ব্রহ্মাস্ত্র কাব্যের ভাষায় মানুষ মারিবার জন্য মন্ত্রযুক্ত একটি বাণবিশেষ কিন্তু উন্নত সাধকদিগের নিকট উহা ব্রহ্মবিদ্যা বা ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নহে। দৈবীশক্তি ঐ মহাতেজস্বী পাতঞ্জল-যোগসিদ্ধির বিরুদ্ধে বিশেষ সাফল্য লাভে সমর্থ নহে। সেইজন্য ইন্দ্রাদি বিশিষ্ট দেবগণ এতদিন রাবণকে বিশেষ ভয়ের চক্ষুতে দর্শন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের পূর্ণ দৈবীশক্তি বা সম্পত্তি আছে, কিন্তু দৈবীশক্তি দ্বারা রাবণের মত পূর্ণ আসুরিক শক্তিতে সিদ্ধ যোগীর এতদিন কোনও ক্ষতি করিতে না পারায় ভগবানকে নিজে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে। অতএব রাবণের দমন জন্য ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী সীতার পুনঃপ্রাপ্তি ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এই স্থানে বাল্মীকির কাব্যে অগস্ত্যমুনি

রামচন্দ্রকে আদিত্য হৃদয় পাঠ ও জপের দ্বারা রাবণ বধের শক্তি-লাভ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। সাধারণ কাব্যে ইহা খুবই সঙ্গত। যে সমস্ত সাধারণ পাঠক রামায়ণকে কাব্য হিসাবে দেখেন তাঁহারা প্রায়ই রজঃ ও তমোগুণাক্রান্ত। তাঁহারা দেবতাদের স্তবস্তুতি ও আভিচারিক ক্রিয়াদি দ্বারা শত্রু নাশ ও ঐশ্বর্য্য সিদ্ধি প্রার্থনা করিতেই অভ্যস্ত। কিন্তু উন্নত সাত্ত্বিকগণ উহার নিঃসারতা ও হেয়তা পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেন, এবং ঐ উপায় রাবণ ও কুম্ভকর্ণের অনুচরগণের উপাদেয় বলিয়া জানেন। গীতা ও উপনিষদাদি শাস্ত্রে ঐ সমস্ত অতি নীচের সাধন ও আত্মার অধোগতি কারক ইহা পদে পদে উক্ত হইয়াছে। ঘোর তমোগুণী সাধক ঐ সমস্ত আশ্রয়ে সংসারে বিষম আবদ্ধ হইয়া নরকের পথ প্রসারিত করিতে থাকে। কৃত্তিবাস এইটি বিশেষ হৃদয়ঙ্গম করিয়া ঐ তমোগুণের প্রক্রিয়া দ্বারা রাবণ বধ না করাইয়া রজোগুণের আশ্রয় লইয়াছেন। তিনি রামকে দিয়া তিন দিন দুর্গাপূজা করাইয়াছেন এবং তাহা আত্মোন্নতি বা চিত্ত শুদ্ধির জন্য নহে। কেবলমাত্র প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য শত্রু নাশের উদ্দেশ্যে। রজোগুণী লোকে জানে দেবতাগণ দক্ষিণায়ণে ছয় মাস নিদ্রিত থাকেন। অতএব আশ্বিন মাসে রাবণ নাশের আবশ্যকতা হওয়ায় বাধ্য হইয়া অকালে ভগবতীকে বিশেষ স্তবস্তুতি করিয়া জাগাইতে হইল। নানা উপহার ও স্তব-স্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া দেবী তাঁহাকে রাবণ বধের জন্য ব্রহ্মাস্ত্র দিলেন এবং তাঁহার চিরদিনের আশ্রিত রাবণকে পরিত্যাগ করিলেন, যেমন সাধারণ মানুষ কোন বড় লোককে অনেক মূল্যবান্ দ্রব্যাদি উপহার দিলে ও তাঁহাদের বিশেষ স্তবস্তুতি করিলে তাঁহারা তাঁহাদের

চিরানুগত ব্যক্তিকে অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করেন। কৃত্তিবাস আদিত্যহৃদয় জপ কার্য্যটিকে অত্যন্ত আভিচারিক ও তামসিক বোধে অগত্যা এইরূপ দুর্গার আরাধনা দ্বারা শক্তিলাভ করাইয়াছেন। এইটি বোধ হয় তিনি দেবী পুরাণ কালিকাপুরাণ বা বৃহন্নন্দিকেশর পুরাণ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। উহাতে "রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ। অকালে ব্রহ্মণা বোধো" ইত্যাদি বচন আছে। কিন্তু পুরাণাদি রচিত হইয়াছে দ্বাপরের শেষে বেদব্যাসের দ্বারা,—কলিতে সাকার সগুণ দেবতার পূজা করিলে তখনকার মনুষ্য কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উন্নতি লাভ করিয়া পরে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হইতে সমর্থ হইতে পারে এইজন্য কৃপাপরবশ হইয়া ভগবান্ ঋষিদের দ্বারা সাকার ও সগুণ ভগবান্ ও পূজালোলুপ, স্তুতি দ্বারা অল্পে সন্তুষ্ট ও সাংসারিক ভোগ্য পদার্থ প্রদানকারী বহুবিধ দেবদেবীর পূজার ব্যবস্থা করাইয়াছেন। ত্রেতায় পুরাণও ছিল না এবং সাকার পূজাও বর্ত্তমান ছিল না। অতএব কৃত্তিবাসের ঐ কল্পনা কলিকালোচিত। রামায়ণের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় জয়লাভে বা শক্তিলাভে আসক্তি পর্য্যন্ত পরিত্যাগ না করিলে ব্রহ্মবিদ্যা ত দূরের কথা, দৈবীশক্তিও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অতএব ঐ দুই বর্ণনাই এ অবস্থায় অপ্রযোজ্য। রামচন্দ্র যতদিন না সীতারূপিণী ব্রহ্মবিদ্যা পুনরুদ্ধার করিতে পারেন ততদিন ঐ মহা আসুরিক শক্তি দমন দ্বারা মনুষ্যের ও দেবতাগণের হিতসাধন করিতে পারেন না, ইহা বুঝিয়া অনন্যচিত্তে কঠিন ধ্যানযোগে সমাধিস্থ হইতে প্রযত্ন করিতে লাগিলেন। অন্যান্য যোগিগণও অনন্য মনে নিজ নিজ স্তরের আধ্যাত্মিক উন্নতিতে মনোযোগ

করিলেন। তাঁহাদের ঐ তীব্র সাধনায় দেবগণ ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন।

রামচন্দ্র ধ্যানযোগে সমাধিস্থ হইয়া ব্রহ্মবিদ্যার সাক্ষাৎ পাইলেন। তখন সীতারূপিণী ব্রহ্মবিদ্যা অগ্নিরূপী পরব্রহ্মের নিকট হইতে রামের সন্নিধানে পুনরাগমন করিলেন এবং রামচন্দ্র কৃতার্থ হইলেন। হনুমান্, বিভীষণ ও লক্ষ্মণ মাতৃভাবে ভগবতীর সেবা করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। এখন রাবণের সমস্ত প্রতাপ চূর্ণ হইয়া গেল। তিনি বুঝিলেন, যে ব্রহ্মবিদ্যা তিনি রামের নিকট হইতে অপহরণ করিয়াছেন বলিয়া এতদিন ধারণা করিতেছিলেন সে ব্রহ্মবিদ্যা এ ব্রহ্মবিদ্যার নিকট অগ্রসর হইবারও অধিকারিণী নহে—তাহাও তিনি এতদিন প্রাণপণে সাধন দ্বারা আয়ত্ত করিবার অধিকারী হন নাই। এখন সে মায়াসীতা বা মায়াচ্ছন্না ব্রহ্মবিদ্যাও রাবণের নিকট হইতে অন্তর্হিতা হইলেন। তিনি দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, পারুষ্য ও অজ্ঞান দ্বারা যে সমস্ত শক্তি ও বিভূতি এতদিন রামের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতেছিলেন, তাহা অতি সত্বর অকর্মণ্য হইয়া গেল এবং রামের বা তাঁহার অনুচরগণের প্রতি সে সমস্ত শক্তি কোনও ক্রিয়া করিতে সমর্থ না হইয়া রাবণকেই তাহারা দারুণ যন্ত্রণা দিতে লাগিল। তাঁহার সমস্ত শিষ্য ও অনুচরগণ এখন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কেহ রামের অনুগত হইয়া ভক্তিযোগ সাধন ভজন আরম্ভ করিল, কেহ বা লঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া দূরে অন্যান্য অসুরের নিকট প্রস্থান করিল। রাবণের নিকট যাহারা অবস্থান করিতেছিল, তাহাদের সকল শক্তিই তখন অপহৃত হইয়াছে। তখন রাবণ নিজের সিদ্ধির ও শক্তির অসারতা পূর্ণরূপে

হৃদয়ঙ্গম করিলেন এবং নিজে ভ্রান্ত পথে গিয়া এবং পৃথিবীর বহুলোককে সেই পথে পরিচালিত করিয়া সংসারে কি মহান্ অনর্থ আনয়ন করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিয়া দারুণ অনুতাপগ্রস্ত হইলেন। তখন ব্যাকুল হইয়া রামের চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। রাম, লক্ষ্মণ ও বিভীষণ তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া ভগবদ্ভক্তির সহিত ভক্তিযোগ সাধনায় দীক্ষিত করিলেন। তাঁহার রাজ্যভার ও অন্যান্য গুরুতর কর্তব্যের ভার তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণের হস্তে সমর্পণ পূর্বক তিনি নিভৃত স্থানে জপধ্যান ও পূজায় চিত্তশুদ্ধ করিতে গমন করিলেন। রামচন্দ্র যে জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা একরূপ সমাপ্ত হইল। আসুরিক তপস্বী ও তামসিক আভিচারিকগণের শক্তিসিদ্ধির দুর্দশা দেখিয়া ভারতে অধিকাংশ লোকে ভগবদ্ভক্তিদ্বারা কর্মযোগ এবং তৎপরে জ্ঞান-যোগে আরোহন করিতে দৃঢ় সংকল্প হইল। রাবণের অধিকাংশ শিষ্যই এখন আসুরিক মার্গ পরিত্যাগ করিয়া বৈদিক শাস্ত্রের উপদেশ অনুযায়ী যে যেরূপ অধিকারযুক্ত, সেই সেই অধিকারের শাস্ত্রীয় আচার, পূজা, জপ, কর্মযোগ বা জ্ঞানযোগ সাধন করিতে লাগিল। সমস্ত তপোবনগুলি বাধা শূন্য হইল। যোগী ঋষিগণ নির্ভয়ে আপনাদের যোগ সাধনে উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। সংসারেও গৃহস্থ ব্যক্তিগণ আপন আপন কর্তব্য কর্ম ভগবদ্ভক্তির সহিত নিষ্কামভাবে ও সমাহিতচিত্তে করিতে করিতে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রাপ্তির যোগ্যতালাভ করিতে লাগিলেন। জনস্থান, পঞ্চবটী, দণ্ডকারণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের সমস্ত স্থানগুলিতে যেখানে পূর্বে অসুর ও রাক্ষস প্রকৃতির লোকে যাগ, যজ্ঞ, পূজা ও

যোগ সাধনে দারুণ বিঘ্ন উৎপাদন করিত, এখন সেখানে ভগবদ্ভজনের স্রোত বহিতে লাগিল। ভগবান গীতায় চতুর্থ অধ্যায়ে তাঁহার অবতারের আবশ্যকতা ও উদ্দেশ্যের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা সফল হইল। গীতার বাক্য যথা :—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

গী ৪।৭—৮

রামচন্দ্রের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন

রাবণ ও তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর শাস্ত্রসম্মত ধর্মগ্রহণের পর রাম লঙ্কা ও দাক্ষিণাত্যের সমস্ত যোগী ও ঋষিগণকে একত্র করিয়া যাহাতে অতঃপর ভজন সাধন যথাশাস্ত্র সম্পাদিত হয়, তাহার সুন্দর ব্যবস্থা প্রণয়ন করিলেন এবং দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন স্থানে সুগ্রীব, ভরদ্বাজ ও অগস্ত্য প্রভৃতি মুনিগণকে এবং লঙ্কায় বিভীষণকে মণ্ডলেশ্বর নির্বাচন করিয়া সমস্ত দক্ষিণ ভারত ধর্মমণ্ডলের তত্ত্বাবধানের ভার তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করিলেন। এই সমস্ত কার্য্যে তাঁহার বনবাসের জন্য নির্দ্ধারিত চতুর্দ্দশ বর্ষ শেষ হইল। উত্তর ভারতের জনগণ লোকমুখে রামের এই সমস্ত অমানুষিক শক্তির পরিচয় অনেকদিন হইতেই প্রাপ্ত হইতেছিল এবং কতদিনে চতুর্দ্দশ বর্ষ শেষ হইবে, দারুণ আগ্রহের সহিত তাহার অপেক্ষা

করিতেছিল। ভরত ও শত্রুঘ্ন রামের রাজ্যভার অতিশয় শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত বহন করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহারা কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া পরম সমাহিত চিত্তে বশিষ্ঠাদির সাহায্যে সুন্দররূপে কর্ত্তব্য কর্ম সম্পাদন করিতেছিলেন। এখন চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হওয়াতে তাঁহাদের আনন্দের আর সীমা রহিল না। ভরত অযোধ্যার বিশিষ্ট বিশিষ্ট যোগী, সামন্ত ও নাগরিকগণকে সঙ্গে লইয়া দাক্ষিণাত্যে রামের সন্নিধানে উপনীত হইলেন এবং তাঁহার কার্য্য স্বহস্তে লইবার জন্য এবং উত্তর ভারতের সর্বত্র ভগবদ্ধর্ম প্রচারের জন্য তাঁহাকে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের জন্য অনুনয় করিলেন। তখন রাম বিভীষণ, সুগ্রীব ও অন্যান্য ঋষিগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া সীতা, লক্ষ্মণ ও ভক্তশ্রেষ্ঠ হনুমানকে সঙ্গে লইয়া অযোধ্যার পথে যাত্রা করিলেন। যে যে স্থান দিয়া তাঁহারা আসিতে লাগিলেন, সেই সেই স্থানের সমস্ত লোকেই তাঁহাদের বিশেষ পূজা করিল। তিনি যোগী ও গৃহস্থগণের ভগবদ্ভাবে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে দেখিয়া পরম আনন্দিত হইলেন। কবন্ধ বিরাধ প্রভৃতি কিরূপ আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিয়াছেন দেখিয়া প্রীত হইলেন ও শৃঙ্গবেরপুরে মহাকর্মযোগী গুহক চণ্ডালের বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। গুহক ও তাঁহার অনুগত ব্যাধগণ আনন্দে অধীর হইয়া সর্বকর্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের সেবায় তিনদিন কিরূপে কাটিল জানিতে পারিলেন না। তিনদিন পরে তাঁহারা রামচন্দ্রের সঙ্গে অযোধ্যা পর্য্যন্ত চলিলেন। অযোধ্যা ও নিকটবর্ত্তী জনসাধারণ পরম শ্রদ্ধাভরে তাঁহাদিগকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া নগরে লইয়া গেল।

চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্বে যে সমস্ত প্রজা ব্রহ্মজ্ঞান সহ্য করিতে না পারাতে রামকে ব্রহ্মবিদ্যা সহ বনে যাইতে হইয়াছিল, এখন সেই প্রজাগণের ভোগসুখে দারুণ বিতৃষ্ণা জন্মিবার ফলে রাম ও ব্রহ্মবিদ্যারূপিনী সীতাকে পাইয়া তাঁহারা আনন্দে অধীর হইলেন এবং নিজ নিজ আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের জন্য প্রাণপণে সাধনভজন করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া সংসারের সমস্ত কর্ম ভগবদর্পণবুদ্ধিতে ও অনাসক্ত চিত্তে সম্পাদন করিতে থাকিয়া জীবন্মুক্ত, স্থিতপ্রজ্ঞ বা গুণাতীত অবস্থায় ব্রহ্মবিদ্যা-রূপিনী সীতাসহ পরমানন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পক্ষপাতশূন্য বিচারে এবং প্রজাদের প্রকৃত উন্নতির জন্য প্রাণপণ পরিশ্রমে সর্বত্র তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা হইতে লাগিল। অযোধ্যারাজ্যের প্রজাগণ মহান আদর্শ সম্মুখে পাইয়া যাগ, যজ্ঞ, সংসারের সমস্ত কর্ত্তব্য এবং যথাশাস্ত্র স্বধর্ম পালন নিষ্কামভাবে ও অনাসক্তচিত্তে করিতে লাগিল। দেশ হইতে ঈর্ষা, দ্বেষ, হিংসা, কাম, ক্রোধ ও লোভ যেন মন্ত্রবলে অন্তর্হিত হইল। সর্বত্র ধর্মশাস্ত্রের আলোচনা, ভগবন্নামকীর্তন, সাত্ত্বিক দান ও লোকহিতকর কর্মের অনুষ্ঠানের স্রোত বহিতে আরম্ভ হইল। ধরাধামে স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইল।

সীতার বনবাস

কিন্তু যুগধর্ম কোথায় যাইবে? ভগবদিচ্ছায় সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভূত ও তিরোহিত হইতেছে। সত্য-যুগে সকলেই প্রায় পূর্ণ নিষ্কামভাবে কর্মযোগ করিয়া পঞ্চাশ

বৎসর বয়সের পরে বাণপ্রস্থ ও তৎপরে পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সের সময় সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করিতেন। কেহ বা ব্রহ্মচর্য্যের পরই সন্ন্যাসী হইতেন। উন্নত রাজর্ষিগণও কোন কোন গৃহস্থব্যক্তি সংসারে কর্ত্তব্যকর্ম সুন্দররূপে সম্পাদন করিয়া কেহ কেহ বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস গ্রহণ না করিয়াও ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হইতেন এবং গৃহস্থ লোককে আদর্শ দেখাইবার জন্য গৃহেই বাস করিতেন। ত্রেতা যুগের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত অনেক গৃহস্থ ও রাজর্ষি এইভাব অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের আদর্শে ভোগবাসনার ও সকাম কর্মের প্রতি সমাজের সাধারণ লোকের বিতৃষ্ণা ছিল। ত্রেতাযুগের শেষের দিকে রামচন্দ্রের অবতারের পূর্ব হইতে যুগধর্মের অনুরোধে আসুরিক ভাবের উদয় হইতে লাগিল। ভোগবাসনা ও ঐশ্বর্য্যের প্রতি অনেকের চিত্ত আকৃষ্ট হইতে লাগিল। ক্রমে বহুলোক ঐ সমস্ত লাভের জন্য আভিচারিক ক্রিয়া, রাজসিক তপস্যা ও সকামভাবে বৈদিক দেবতাদের অর্চনা আরম্ভ করিল। রামচন্দ্রের অসুর দমন কার্য্যের দ্বারা সাময়িকভাবে অনেকস্থানে ঐ সমস্ত নীচ বৃত্তিকে ঘৃণা করিয়া ভগবদ্ভজনের দিকে লোকে আকৃষ্ট হইল বটে, কিন্তু রাজসিকতা ও তামসিকতা প্রচ্ছন্ন-ভাবে সমাজের মধ্যে বর্ত্তমান ছিল। আসুরিক প্রকৃতির লোকগণ সমাজের ভয়ে মনের ভাব কিয়দ্দিন চাপিয়া রাখিয়া বাহিরে ভগবদ্ভক্তি ও কর্মযোগের অভিনয় করিতেছিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহারা তাহাদের অনুগত ব্যক্তিগণকে সুকঠিন কর্মযোগ পরিত্যাগ করিয়া ভোগানন্দ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সকাম কর্ম ও শক্তিসিদ্ধিপ্রাপ্তির জন্য রাজসিক ও তামসিক তপস্যায় প্রবৃত্ত করাইল। সাধারণ

লোকও পূর্ণ ত্যাগ ও বৈরাগ্য পালন করিতে যাইয়া হাঁফাইয়া উঠিল। তাহারা রামের আদর্শ অনুকরণ করা দারুণ কষ্টকর বোধ করিল এবং বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহারা ব্রহ্মবিদ্যা বা সীতাকে আর সমাজে চাহে না।

রাজা ও রাজপুরুষদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে তাহারা বাহিরে কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের ভাণ দেখাইতে লাগিল; কিন্তু অন্তরে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করিতে লাগিল। তাহাদের এই আচরণ ক্রমশঃ রাজপুরুষদের ও আদর্শ রাজা রামচন্দ্রের অগোচরে রহিল না। রামচন্দ্র বুঝিলেন তাঁহার অসুরদমন কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে বটে, কিন্তু যুগধর্মের বলে এখন হইতে সংসারে মনুষ্য স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া কর্মযোগ মাত্র সাধন করিতে পারিবে। গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞানের কঠিন সাধন আর করিতে পারিবে না। অতএব সীতার বা ব্রহ্মবিদ্যার সমাজে আর স্থান নাই। এই চিন্তা করিয়া প্রজাগণের মনোরঞ্জন জন্য যুগধর্মের বশে সীতা বা ব্রহ্মবিদ্যাকে অরণ্যবাসী বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাসাশ্রমাবলম্বী ঋষিদের নিকট প্রেরণ করিলেন অর্থাৎ এখন হইতে আর গৃহস্থগণ ব্রহ্মবিদ্যা লইয়া সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিতে পারিবেন না বুঝিয়া কেবল মাত্র সংসারত্যাগী যোগীদের মধ্যেই ব্রহ্মবিদ্যা প্রেরণ করিলেন। গৃহস্থ প্রজাগণ যাহাতে ভগবদ্ভক্তির দ্বারা নিষ্কাম কর্ম সম্পাদন করিয়া বনে যাইয়া পরে ব্রহ্মবিদ্যার আরাধনা করিতে পারেন, সেই আশায় রাম পূর্ণ অনাসক্তির সহিত নিজে কর্মযোগ সুন্দররূপে আচরণ করিয়া তাহাদিগকে শিখাইতে লাগিলেন। তাঁহার অনুকরণে বিশিষ্ট গৃহস্থগণ কর্মযোগে আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন এবং

উত্তরোত্তর উন্নত হইতে লাগিলেন। কোথাও যে ব্যতিক্রম হইতে লাগিল না তাহা নহে। প্রকৃতির নিয়মই এই যে, সব মনুষ্য সমান হইতে পারে না। পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কার বলে সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক এবং গুণাতীত—এই চতুর্বিধ ব্যক্তি জগতে রহিয়াছে। তবে ভিন্ন ভিন্ন যুগে ইহাদের অনুপাত ভিন্ন প্রকারের হয়। ত্রেতাযুগে রামের রাজত্ব সময়ে শতকরা আট দশজন তামসিক প্রকৃতির লোক ছিল। তাহারা সমাজের উন্নত ও সাধারণ লোকের ভয়ে গোপনে ভোগ-বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য ও শক্তি লাভের উদ্দেশ্যে অশাস্ত্রবিহিত সাধনা করিত। ইহার দুই একটি দৃষ্টান্ত রামায়ণে বর্ণিত আছে। যথা ঃ—একদিন একজন ব্রাহ্মণ রামের নিকট আসিয়া বলিলেন, রাজন্! আপনার রাজ্যে পাপ প্রবেশ করিয়াছে। নতুবা আমার দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক পুত্রের অদ্য অকাল-মৃত্যু হইল কেন? অবশ্য আমার পুত্রের মৃত্যুর জন্য ব্যথিত নহি। কিন্তু রাজ্যে পাপ প্রবেশ না করিলে এরূপ সত্ত্বগুণালম্বী ব্রাহ্মণের গৃহে অকালমৃত্যু সম্ভব হয় না। রাজা প্রজামণ্ডলীর ধর্মের রক্ষক। আপনার সর্বদা সাবধান থাকা কর্ত্তব্য, কোথায় আপনার অজ্ঞাতসারে পাপাচরণ হইতেছে। সেইজন্য আমি কর্ত্তব্যবোধে আপনাকে এই অকালমৃত্যু সংবাদ জানাইলাম। রামচন্দ্র সন্ধান লইয়া জানিলেন যে শম্বুক নামে এক শূদ্র গোপনে দারুণ তামসিক তপস্যা করিতেছে। তাহার উদ্দেশ্য স্তম্ভন, উচাটন, বশীকরণ ও মারণাদি আভিচারিক সিদ্ধি। সে ঊর্দ্ধপদে, হেটমুণ্ডে, প্রজ্বলিত অগ্নির অতি নিকটে নিজ শরীরকে দারুণ যন্ত্রণা দিয়া ঐ সমস্ত তপস্যা আচরণ করিতেছে এবং পরের অনিষ্টই তাহার একমাত্র

কাম্য। শম্বুক এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে সমাজের সর্বনাশ করিবে। তাহার প্রচণ্ড সিদ্ধি ও শক্তি লাভ হইলে সমাজের অনেকে লোভে তাহার অনুকরণ করিবে এবং ব্যভিচার, মদ্যমাংস-ভক্ষণ, একজনের পীড়া অন্য দেহে সঞ্চালন, পরস্ত্রী বশীভূতকরণ, মারীহোম দ্বারা অপরের প্রাণনাশ ইত্যাদি আসুরিক কার্য্য আবার সমাজে প্রবেশ করিবে। এইজন্য প্রজাগণের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে শম্বুকের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন।

যমুনাতীরের মুনিগণ আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, রাবণ রাজার প্রশিষ্য লবণনামা এক আসুরিক শক্তিশালী ব্যক্তি মথুরার নিকট সমস্ত তপোবনে ঋষিদের কর্মযোগে ও জ্ঞানযোগে নানা বাধা উৎপাদন করিতেছে। তাহার ও তাহার অনুচরগণের অত্যাচারে মুনি ও ঋষিগণ সাধন ভজন করিতে পারিতেছেন না। তাঁহাদিগকে ঐ অসুরগণ বলপূর্বক তামসিক তপস্যা করিবার জন্য ও তাহাদের ঘৃণিত আচার গ্রহণ করিবার জন্য বিশেষ বল প্রয়োগ করিতেছে। ইহা শুনিবামাত্র রামচন্দ্র লবণ ও তাহার অনুচরগণকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবার জন্য তাঁহার ভ্রাতা শত্রুঘ্নকে মথুরায় পাঠাইলেন। লবণ মহাশক্তি সম্পন্ন হইয়াছিল। তাহাকে দমন করিতে শত্রুঘ্নকে বিশেষ বেগ পাইতে হইল, কিন্তু অবশেষে তিনি লবণকে পরাজিত করিয়া তাহাকে ঋষিদিগের নিকট বেদোক্ত ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিলেন। রামচন্দ্রের সতর্কতায় এবং সম্পূর্ণ অনাসক্তির সহিত প্রজাগণের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক মঙ্গল করিবার ইচ্ছায় প্রজাগণ এখন নিরুপদ্রবে কর্মযোগ সাধন করিতে লাগিল। সংসারে থাকিয়া জ্ঞানযোগ সাধনা করিতে তাহাদের সামর্থ্য না

হইলেও ভগবদ্ভক্তির সহিত সাংসারিক কর্ত্তব্যগুলি নিষ্কামভাবে এবং অনাসক্তির সহিত সুন্দররূপে সম্পাদন করিতে লাগিল। এইরূপ যখন রামের রাজ্যের সর্বত্র ভগবদ্ভক্তি ও কর্মযোগ সাধনা বিশেষরূপে প্রবল হইল তখন রাম এক বৎসরব্যাপী এক মহাযজ্ঞ করিলেন। কাব্যের ভাষায় উহার নাম অশ্বমেধ যজ্ঞ।

পুরাণে যেরূপ অশ্বমেধ যজ্ঞের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা দিতেছি। রাজারা পত্নীর সহিত এই যজ্ঞ করিতেন। যে রাজা চতুঃপার্শ্বস্থ সমস্ত রাজার উপর একাধিপত্য করিতে পারিতেন, সেই দিগ্বিজয়ী সম্রাটই এই যজ্ঞ শেষ করিবার অধিকারী হইতেন। তিনি যজ্ঞের জন্য একটি সুলক্ষণযুক্ত অশ্বকে কর্মকাণ্ডের বিধি অনুযায়ী ছাড়িয়া দিতেন। তাহার সঙ্গে বিশিষ্ট সৈন্যদল থাকিত। অশ্বটি যথেচ্ছ বিচরণ করিত। কেহ তাহাকে ধরিলে ঐ সৈন্যদল তাহাকে দণ্ডিত করিয়া তাহার সম্পত্তি অপহরণ করিত ও প্রাণবধও করিত। যদি কোনও ক্ষমতাশালী রাজা উহাকে ধরিত, তাহা হইলে প্রবল যুদ্ধ হইত এবং যজ্ঞকারী রাজা পরাস্ত হইলে তাঁহার যজ্ঞ পণ্ড হইত। কিন্তু তিনি জয়লাভ করিলে আবার অশ্বকে যথেচ্ছ যাইতে দিতে হইত এবং পরাজিত রাজা যজ্ঞকারী রাজার অধীনে সামন্ত শ্রেণীতে পরিগণিত হইতেন। এইরূপে সমস্ত দেশ ভ্রমণ করাইয়া আনিয়া সেই অশ্বকে যজ্ঞে বলি দেওয়া হইত। তাহার ফলে স্বর্গপ্রাপ্তি হইবার কথা পুরাণাদিতে আছে। এখন রামচন্দ্র ত্রেতাযুগে এরূপ সকাম এবং অহঙ্কারপূর্ণ যজ্ঞ করাইবেন ইহা বাল্মীকির অভিপ্রেত নহে। কাব্য হিসাবে রামায়ণ পাঠ যাহারা করে তাহাদের এরূপ যজ্ঞই বিশেষ প্রীতিপ্রদ। কত রাজার

সহিত যুদ্ধ হইবে, কত ধন অর্থ পাওয়া যাইবে, দৈহিক বলের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইবে, কত ধূমধাম করিয়া যজ্ঞ হইবে, কত লোকজন খাইবে এবং নানাবিধ দান পাইবে, সাধারণ লোক এই সমস্ত অতিশয় ভালবাসে। তাহাদের সন্তোষের নিমিত্ত ঐরূপ অশ্বমেধের বর্ণনা থাকিলেও উন্নত ব্যক্তিকে বুঝিতে হইবে, রামচন্দ্র কিরূপ যজ্ঞ বৎসরাধিক কাল ধরিয়া সম্পন্ন করিলেন। তিনি তপোবনবাসী বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্রহ্মযোগসাধনরত মুনিগণকে অযোধ্যায় আনাইয়া তাঁহাদের দ্বারা উপনিষদাদি আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের সম্পূর্ণ উদার ব্যাখ্যা উপনিষদের সুন্দর উপদেশগুলি ও চরিত্রগুলি অবলম্বন করিয়া রচিত সুমধুর গীতাভিনয় প্রদর্শন এবং স্থিতপ্রজ্ঞ ও গুণাতীত যোগিগণকে সমাজের সাধারণ ব্যক্তিগণের সম্মুখে আদর্শরূপে স্থাপন করিলেন। বহুদূর হইতে প্রজাগণ আসিয়া এই সমস্ত দর্শন ও শ্রবণে মুক্তিই যে জীবের একমাত্র পুরুষার্থ, ইন্দ্রিয়ভোগ্য পদার্থ যে অতি অকিঞ্চিৎকর ও হেয়, স্বর্গসুখ যে অতি অসার ও ক্ষণিক ইহা বিশেষরূপে ধারণা করিতে পারিলেন। রামের ধারণা হইল এইবার প্রজাগণ যেরূপ উন্নত আদর্শ পাইয়াছে, তাহাতে সংসারে থাকিয়াই তাহারা ব্রহ্মবিদ্যা সাধন করিতে পারিবে, অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যারূপিনী সীতাকে আবার বন হইতে অযোধ্যায় আনা সম্ভব হইবে। যজ্ঞ উদ্‌যাপনের দিন তিনি প্রত্যেক গ্রাম ও নগরের বিশিষ্ট বিশিষ্ট প্রজাগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সভায় বিরাট জনসমাগম হইল। তখন তিনি সর্বসমক্ষে এই প্রস্তাব উত্থাপনা করাইলেন, যে রাজ্যের সকলে এখন যেরূপ আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ করিয়াছেন, তাহাতে সংসারের সমস্ত কর্ম করিয়া ব্রহ্মযোগ বা

জ্ঞানযোগে সাধনা করিতে তাঁহারা প্রস্তুত আছেন কিনা অর্থাৎ সীতাকে তাঁহারা বন হইতে অযোধ্যায় প্রত্যানয়নের পক্ষপাতী কিনা। তাঁহার প্রশ্নে উপস্থিত গৃহস্থগণ সকলেই অধোবদনে বসিয়া রহিলেন। হাঁ কিংবা না, ইহার কিছুই বলিতে পারিলেন না। রামচন্দ্র বুঝিলেন যুগধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলিবে না। যে জ্ঞানযোগ এতদিন পর্য্যন্ত উন্নত গৃহস্থগণ সংসারে থাকিয়াও সাধন করিতে সমর্থ ছিলেন, আর তাহা করিতে গৃহস্থগণ অশক্ত হইয়াছেন এবং জনক রাজাই গৃহস্থ সন্ন্যাসীর শেষ। তিনি বুঝিলেন সংসারাশ্রমে কর্মযোগ সাধন শেষ করিয়া জ্ঞানযোগে আরোহণেচ্ছু সাধকের এইবার বনে বাস করিয়া একান্তে সাধন আবশ্যক। অতএব সীতার আর সংসারে স্থান নাই। তিনি গৃহস্থগণের চক্ষুর নিকট হইতে অদৃশ্য হইলেন। কাব্যের ভাষায় ইহাই সীতার পাতাল প্রবেশ।

লক্ষ্মণ বর্জন

সীতার বা ব্রহ্মবিদ্যার সংসার হইতে অন্তর্দ্ধানের পর রামের নিকট একদিন কালপুরুষ আসিয়া বলিলেন, “আপনার সহিত আমার গোপনে কিছু কথা আছে, সে সময় যে কেহ আমাদের কথা শুনিতে পাইবে, তাহাকে বধ করিবার প্রতিজ্ঞা আপনাকে করিতে হইবে।” রাম উহাতে সম্মত হইয়া দ্বারপালের পরিবর্ত্তে স্বয়ং লক্ষ্মণকে দ্বারদেশে অবস্থিত থাকিতে ও কাহাকেও তথা প্রবেশ করিতে না দিতে আদেশ করিলেন। কালপুরুষ তাঁহাকে

তথায় ব্রহ্মার অনুরোধ জানাইলেন যে, তাঁহার যে জন্য পৃথিবীতে অবতার তাহা শেষ হইয়াছে। অতএব সত্বর বৈকুণ্ঠে আগমন করুন। ইত্যবসরে মহাক্রোধনস্বভাব দুর্বাসা দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণকে ত্বরায় তাঁহার আগমনবার্ত্তা রামের নিকট জানাইবার আজ্ঞা দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সংবাদ না দিলে দারুণ অভিশাপ দিবার ভয় দেখাইলেন। লক্ষ্মণ পাছে রামের কোন ক্ষতি হয়, এই আশঙ্কায় তৎক্ষণাৎ রামকে এই সংবাদ জানাইলেন। রামচন্দ্র কালপুরুষকে বিদায় দিয়া লক্ষ্মণকে বধ করিতে হইবে এই কথা ভাবিয়া আকুল হইলেন এবং পুরোহিতের পরামর্শে উন্নতব্যক্তিকে ত্যাগ করিলেই তাহা তাঁহার বধের সমান—ইহা শুনিয়া ধর্মরক্ষার্থ লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিলেন। ইহা কাব্যে বর্ণিত আছে। এখন ইহার গূঢ় অর্থ কি তাহা অনুধাবন করা আবশ্যক। প্রথমতঃ দেখিতে হইবে তাঁহার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ার পর হইতে বৈকুণ্ঠ শূন্য আছে কিনা।

পুরাণের এরূপ বর্ণনা যে, ভগবান অবতার গ্রহণ করিলে সত্যলোক বা বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মলোক বা কৈলাস খালি থাকে। ভাগবতেও শিব ব্রহ্মাদি দেবগণ দ্বারকায় আসিয়া কৃষ্ণকে গোলোকে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন। ইহা কাব্য ও পুরাণেই শোভা পায়। যতদিন ভগবান পৃথিবীর একস্থানে অবতার গ্রহণ করেন, ততদিন পৃথিবীর অন্যস্থান, স্বর্গাদি সপ্তলোক ও অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডে কি ভগবান্ অনুপস্থিত থাকেন এবং ততদিন অন্যান্য কোনও স্থানে কি অবতাররূপে ভগবান্ জন্ম গ্রহণ করিতে পারেন না? ইহার উত্তর এই যে, ভগবান্ বা ব্রহ্ম পাঁচ ভাবে

সর্বদা বিদ্যমান, যথা—১ম তিনি নির্গুণ নির্বিশেষ পরমব্রহ্মভাবে সর্বদাই অবস্থিত আছেন, তাঁহাতে জীব জগৎ কিছুই নাই। প্রকৃতির পৃথক উন্মেষ নাই। গীতায় আছে ঃ—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহং ইদং কৃৎস্নং একাংশেন স্থিতো জগৎ ॥

গী ১০।৪২—

অর্থাৎ অর্জুন তোমাকে আর কি বেশী জানাইব। ইহা জানিও আমি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগুলি এক অংশে ধারণ করিয়া অবস্থিত আছি।

২য়—তিনি তাঁহার সৃষ্ট প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে সর্বদা সৃষ্টি স্থিতি-লয়কারী ঈশ্বর বা সগুণ ভাবেও সর্বদা অবস্থিত আছেন। ভগবান না থাকিলে কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একক্ষণও চলিতে পারে?

৩য়—তিনি তাঁহার সৃষ্ট প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে অনন্তস্থানে এক সময়েই অবতাররূপে জীবের মঙ্গল বিধান করিতেছেন। তাঁহার কি মোটে একটি পৃথিবী ও ভারতের মত একটি ক্ষুদ্র দেশই সম্বল?

৪র্থ—তিনি সর্বদা সমস্ত জগতে অগণিত জীবের আত্মরূপে সর্বদা অবস্থান করিতেছেন—তিনি গীতায় বলিয়াছেন, "অহমাত্মা গুড়াকেশ! সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।" হে অর্জুন! আমি সকল জীবের হৃদয়ে আত্মভাবে বাস করিতেছি। তিনি একক্ষণ অদৃশ্য হইলে জীবের জীবত্বের লোপ হয়।

৫ম—তিনি সর্বদা সমস্ত জগতে জড় অর্থাৎ অচেতন ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ প্রভৃতিরূপে বিরাজিত আছেন। তিনি যেমন জীবের আত্মা,

তেমনি জীবের দেহও তিনি ভিন্ন আর কেহ নহেন। ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত আর দ্বিতীয় পদার্থের সত্তাই যখন নাই, তখন জড় বলিয়া আমরা নীচের জীব, যাহা ধারণা করি তাহা ব্রহ্মব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে।

প্রথমতঃ এখন বুঝিতে পারা গেল ভগবানকে ডাকিয়া পাঠাইতে হয় না এবং তিনি সর্বদাই বৈকুণ্ঠে বর্ত্তমানও আছেন। দ্বিতীয়তঃ—পুরাণের অদ্ভুত চরিত্র এই দুর্বাসা ঋষিটী। পুরাণকারগণ ক্রোধী ঋষি দেখাইতে গেলেই এই ঋষিটীর শরণাপন্ন হন।

ইনি সমস্ত পুরাণেই ক্রোধের অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ। রামায়ণে আছেন, মহাভারতে দুর্যোধনের দ্বারা প্রেরিত হইয়া দ্বাদশ সহস্র শিষ্যকে লইয়া কাম্যক্ বনে দ্রৌপদীর ভোজনের পর অতিথি হইয়া পাণ্ডবদের সর্বনাশের জন্য ভীষণ তামসিক বৃত্তি লইয়া আছেন। ভাগবতে মহাভক্ত অম্বরীষের প্রতি দারুণ কুপিত হইয়া অভিশাপ দিতে উদ্যত হইলে সুদর্শন চক্র তাঁহাকে ত্রিভুবনে ভ্রমণ করাইয়াছে। কালিদাসের কাব্যেও বিরহবিধুরা শকুন্তলাকে এই দুর্বাসা দারুণ অভিশাপ দিয়া কি ভীষণ যন্ত্রণা দিয়াছেন! যথার্থতঃ ঋষি কি কখনও ক্রুদ্ধ হন? সাধারণ মানুষ কর্মযোগ করিতে করিতে দৈবী সম্পদ লাভ করেন, তাহাতেই তাঁহারা ক্রোধকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য। ঋষিগণ পূর্ণভাবে দৈবী সম্পৎ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের ক্রোধের অস্তিত্ব কোথায়? কামনা প্রতিহত হইলে ক্রোধের উৎপত্তি হয়। ঋষিদের কি কামনা আছে যে তাহা প্রতিহত হইয়া ক্রোধে পরিণত হইবে?

তৃতীয়তঃ—রামের পুরোহিত ঠাকুরের শাস্ত্রের বিধানদান।

রাম প্রতিজ্ঞা করিলেন কালপুরুষের সহিত কথাবার্ত্তার সময় যে উপস্থিত হইবে তাহাকে তিনি বধ করিবেন। কিন্তু লক্ষ্মণ অত বড়লোক এবং রামের এত প্রিয়—এরূপস্থলে এরূপ বিধানদান কলিকালের জমিদারদের সভাপণ্ডিত বা পুরোহিতের মত ত্রেতাযুগের রামচন্দ্রের মত রাজার পুরোহিতের কি শোভা পায়? এখানে নিগূঢ় অর্থ এই যে রামচন্দ্র বুঝিলেন, যে কার্য্যের জন্য ভারতে তাঁহার ঐ সময়ে অবতার গ্রহণ, তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতএব এখন আর লক্ষ্মণ বা রজোগুণের সাহায্যের আবশ্যকতা নাই। কার্য্য করিবার যতদিন আবশ্যকতা আছে, ততদিন রজোগুণের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। এখন তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে অবস্থিত থাকিয়া ক্রমে তাহাও পরিত্যাগ করিয়া নিজ স্বরূপে প্রবেশ করিবেন। এইজন্যই লক্ষ্মণরূপী রজোগুণকে বর্জন করিলেন। লক্ষ্মণ সরযুতীরে কুটীর নির্মাণ করিয়া তথায় ধ্যানস্থ হইলেন। তিনি জনকরাজার নিকট ব্রহ্মবিদ্যাকে মাতৃরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এখন পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী জ্ঞানভূমিতে আরোহণ করিয়া সমাধিতে আত্মস্বরূপে প্রবেশ করিলেন।

রামচন্দ্রের লীলাবসান

ধর্মের গ্লানি নিবারণের উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে অবতীর্ণ রামরূপী ভগবান নিজ কার্য্য সমাপন করিয়া এখন আপনার স্বরূপে প্রত্যা-বর্ত্তনের জন্য সংকল্প করিলেন। ইহা শুনিয়া ভরত ও শত্রুঘ্নও স্বরূপে প্রত্যাবর্ত্তনের ইচ্ছা করিলেন। তাঁহারা রামের ধর্মস্থাপন

কার্য্যের সহায়করূপে অবতীর্ণ কিষ্কিন্ধ্যার সুগ্রীবাদি যোগিগণকে এই সংবাদ প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা রামের কার্য্য শেষ হইয়াছে অর্থাৎ পৃথিবীতে ধর্মের গ্লানি নিবৃত্ত হইয়াছে এবং বৈদিক ধর্ম পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা বুঝিয়া কেহ কেহ নির্গুণ ব্রহ্মে নির্বাণ লাভের জন্য এবং কেহ কেহ দেবযান মার্গে ব্রহ্মলোকে গমনের জন্য আপন আপন স্তরের সাধনায় তীব্রভাবে মনোনিবেশ করিলেন। রামচন্দ্রের স্বরূপে প্রত্যাবর্ত্তন জন্য আর কোনও সাধনের আবশ্যকতা নাই, তথাপি নিজে আচরণ করিয়া মানুষকে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে তিনি বনে গমন করিয়া কিছুদিনের মধ্যে ধ্যান ও সমাধিযোগে তুরীয়া নাম্নী জ্ঞানভূমিতে উন্নীত হইয়া আত্মস্বরূপে প্রবেশ করিলেন। হনুমান ও বিভীষণকে রামায়ণে অমর বলিয়া বর্ণনা আছে, পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, তাঁহারা এই নশ্বর পাঞ্চভৌতিক স্থূল দেহ লইয়া অমরত্বের অধিকারী হন নাই। তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ হইয়াছেন, অতএব তাঁহাদের অমৃতত্ব লাভ হইয়াছে। তাঁহাদের প্রারব্ধ কর্ম শেষ হইবামাত্র সমাধিতে তাঁহারা আত্মস্বরূপে প্রবেশ করিবেন কিংবা ঈশ্বর কোটির জীব হইয়া যুগে যুগে ভগবানের কার্য্যের সাহায্যের জন্য ব্রহ্মাণ্ডন্তবর্তী যে কোনও স্থানে স্বেচ্ছায় দেহধারণ করিয়া ধর্মের গ্লানি নিবারণ করিবেন। তাঁহাদের দেবযানে বা অন্য কোনও যানে প্রাণোৎক্রমণ হইবে না। তাঁহারা জীবদবস্থায় যেমন ব্রহ্মে অবস্থিত, দেহ ত্যাগ হইলেও সেইরূপ অবস্থিতই থাকিবেন। এই দুইজন ব্রহ্মজ্ঞ এখনও সংসারে তাঁহাদের কিছুদিন অবস্থানের আবশ্যকতা আছে বুঝিয়া জীবহিতার্থ দেহধারণ করিয়া রহিলেন। তাঁহারা এখন গুণাতীত ব্রহ্মভূত, জীবন্মুক্ত পুরুষ। অযোধ্যা ও

সন্নিহিত স্থানের উন্নত ব্যক্তিগণ রামাদি ভ্রাতার এই প্রয়াণ দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহাদের আদর্শ অনুসরণ করিয়া নিজেরাও যাহাতে ঐরূপ নির্বাণ লাভ করিতে পারেন, সেজন্য অবিশ্রান্তভাবে ধ্যান ও সমাধিলাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

উপসংহার

মনুষ্য নিজ নিজ কর্মসংস্কার বশে ইন্দ্রিয় ভোগ্য পদার্থে আসক্ত এবং যাহারা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান তাহারা ঐ সমস্ত ভোগ্য পদার্থ লাভের জন্য তামসিক ও রাজসিক সাধনা করিয়া শক্তি ও বিভূতি লাভের চেষ্টা করে। মহর্ষি বাল্মীকি মনোরম কাব্য প্রণয়ন করিয়া সুকৌশলে মানুষকে ঐ সমস্ত রাজসিক ও তামসিক সাধনার হেয়তা এবং ভোগের অসারতা প্রদর্শন করিয়া সংসারাসক্ত জীবকে শাস্ত্রোক্ত কর্মযোগ সাধনে প্রলুব্ধ করিবার জন্য জনক রাজা বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, হনুমান, সুগ্রীব, বিভীষণ ও তৎকালীন নানা ঋষি এবং ব্যাধজাতীয় গুহক ও শ্রমণার নিষ্কাম ও ভগবদ্ভক্তি-পূর্ণ কর্মাদি বর্ণনা করিয়া তাহার চিত্তশুদ্ধির ও সাধন চতুষ্টয়লাভের সাহায্য করিলেন—তৎপরে রামচন্দ্র, জনক, লক্ষ্মণ, হনুমান ও বিভীষণের ব্রহ্মত্বলাভ বর্ণনা করিয়া মুক্তিই যে মানবের পরমপুরুষার্থ স্বর্গ ও পৃথিবীতে যত ভোগ আছে, তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর ও হেয়, ইহা প্রদর্শন করিয়া বেদান্ত প্রতিপাদিত ব্রহ্মযোগে মানুষকে লইয়া যাইবার পথ প্রদর্শন করিলেন। অতএব রামায়ণ একাধারে মহাকাব্য ও উপনিষদ্। যে যেমন অধিকারী, সে এই মহাগ্রন্থ

হইতে নিজস্তরানুযায়ী সাধন প্রণালী শিক্ষা করিতে পারে এবং উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিয়া পরমপুরুষার্থ লাভ করিতে সমর্থ হয়। যেমন যেমন সাধন ক্রমশঃ উচ্চ হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে ইহার অন্তর্নিহিত অর্থ সাধকের হৃদয়ঙ্গম হয় এবং সেইজন্য এই একই গ্রন্থ মানবের উপদেষ্টা গুরুরূপে শেষ পর্য্যন্ত উপকার করে। অন্য কবির কাব্যে ইহা সম্ভব নহে। সেই সমস্ত কাব্যে সাধনের সর্বনিম্নস্তর হইতে উচ্চতমস্তর পর্য্যন্ত সাহায্য প্রাপ্তি অসম্ভব। কতকগুলি কাব্য মধ্যস্তরের সাধকের সাহায্য করে এবং অধিকাংশই সাধারণ ব্যক্তির সাময়িক চিত্তবিনোদন ও ভোগবিলাসের পথ পরিষ্কার করিয়া অধঃপতনে সাহায্য করিবার জন্য প্রণীত হয়।

জীবহিতার্থ যুগে যুগে নরদেহধারী ভগবান্‌কে ভক্তিসহকারে প্রণাম করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকের উপসংহার করিলাম। ওঁ তৎসৎ ওঁ॥

—বন্দনা—

বিশুদ্ধং পরং সচ্চিদানন্দরূপং, গুণাধারমাধারহীনং বরেণ্যম্ ।
মহান্তং বিভান্তং গুহান্তং গুণান্তং, সুখান্তং স্বয়ং ধাম রামং প্রপদ্যে ॥১

শিবং নিত্যমেকং বিভুং তারকাখ্যং, সুখাকারমাকারশূন্যং সুমান্যম্ ।
মহেশং কলেশং সুরেশং পরেশং, নরেশং নিরীশং মহীশং প্রপদ্যে ॥২

যদাবর্ণয়ৎ কর্ণমূলেঽন্তকালে, শিবো রাম রামেতি রামেতি কাশ্যাম্ ।
তদেকং পরং তারকব্রহ্মরূপং, ভজেঽহং ভজেঽহং ভজেঽহম্
ভজেঽহম্ ॥৩

মহারত্নপীঠে শুভে কল্পমূলে, সুখাসীনমাদিত্যকোটি প্রকাশম্ ।
সদা জানকীলক্ষ্মণোপেতমেকং, সদা রামচন্দ্রং ভজেঽহং ভজেঽহম্ ॥৪

ত্বমেবাসি দৈবং পরং মে যদেকং, সুচৈতন্যমেতৎ ত্বদন্যন্ন মন্যে ।
যতোঽভূদমেয়ং বিয়দ্-বায়ু-তেজো, জলোর্ব্ব্যাদিকার্য্যঞ্চরঞ্চাচরঞ্চ ॥৫

নমঃ সচ্চিদানন্দরূপায় তস্মৈ, নমো দেবদেবায় রামায় তুভ্যম্ ।
নমো জানকী-জীবিতেশায় তুভ্যং, নমঃ পুণ্ডরীকায়তাক্ষায় তুভ্যম্ ॥৬

—প্রণাম—

রামায় সত্যসন্ধায় রাজর্ষিপ্রবরায় চ ।
ব্রহ্মণে হি নমস্তস্মৈ লীলয়া নররূপিণে ॥১

রামং লক্ষ্মণপূর্বজং রঘুবরং সীতাপতিং সুন্দরং
কাকুস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয়ং ধার্মিকং।
রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্ত্তিং
বন্দে লোকভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রাবণারিম্ ॥২

দক্ষিণে লক্ষ্মণধন্বী বামতো জানকী শুভা।
পুরতো মারুতির্যস্য তাং নমামি রঘুত্তমম্ ॥৩

রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ ॥৪

নীলাম্বুজ-শ্যামল-কোমলাঙ্গং সীতা-সমারোপিত-বামভাগম্।
পাণৌ মহাশায়ক-চারুচাপং নমামি রামং রঘুবংশনাথম্ ॥৫

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

——:০:——

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৪	সর্বকর্মানি	সর্বকর্ম্মাণি
১	৪	৩৭—৩৮	৩৬—৩৭
২	৪	জনিষু	যোনিষু
২	৬	মামপ্রাপ্লৈব	মামপ্রাপ্যৈব
৩	১৩	ত্রহ্মা	ব্রহ্মা
৬	৩	নিদ্রাগ্রস্থ	নিদ্রাগ্রস্ত
৮	৮	পরিনাম	পরিণাম
১২	৮	সাধুনাং	সাধূনাং
১৩	৬	মনুরিক্ষাকবেঽব্রবীৎ	মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ
১৯	১৮	যদীদৃশম	যদীদৃশম্
২০	২	বশিষ্ট	বশিষ্ঠ
২০	৪	হ্যবসোঽপি	হ্যবশোঽপি
২০	৬	প্রযত্নাদ	প্রযত্নাদ্
২০	২০	ব্রক্ষ	ব্রহ্ম
২৫	২০	ব্যতিত	ব্যতীত
২৭	১০	দৈবীমতিজাতস্য	দৈবীমভিজাতস্য
২৯	৮	পূতপাপাঃ	পূতপাপা
২৯	১৩	বিশান্তি	বিশন্তি
৩৪	১৮	শান্ত	শান্তো
৪৬	১০	তারও	আরও
৫১	১৯	হইল	হইলে

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫৬	৪	নিগ্নন্তি	নিবগ্নন্তি
৫৬	১৫	মন্দতায়	মন্দতার
৬৪	৬	ব্যাপাশ্রিত্য	ব্যপাশ্রিত্য
৬৪	১৮	ব্রহ্মান্তের	ব্রহ্মাণ্ডের
৬৬	১	দুষ্কৃতনো	দুষ্কৃতিনো
৬৬	৮	মোমাশা	মোঘাশা
৬৬	৯	প্রকৃতং	প্রকৃতিং
৭০	৬	চলমধ্রুবম্	চলমধ্রুবম্
৭৯	৬	সীতাক্কপিনী	সীতারূপিনী
৮০	১২	দুস্কর	দুষ্কর
৮৩	১৩	আয়ত্ব	আয়ত্ত
৯০	১৩	যোগিনামের	যোগিনামেব
১১৮	৩	পৃধিবীতে	পৃথিবীতে
১২২	৩	শান্তমুত্তিং	শান্তমূর্ত্তিং
১২২	৬	রঘুওমম্	রঘূত্তমম্

* মুদ্রণ জনিত অনিচ্ছাকৃত দোষত্রুটিগুলি সহৃদয় পাঠক—পাঠিকাগণকে মার্জনার চক্ষে দেখিতে অনুরোধ করি।

শ্রীশ্রীগীতামৃত

শ্রীগীতার সম্পূর্ণ অভিনব অসাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা)

চকদীঘি সারদাপ্রসাদ বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক

শ্রীসতীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এম. এ. কর্তৃক ব্যাখ্যাত

সহস্রাধিক পৃষ্ঠা—মূল্য ছয় টাকা মাত্র

প্রকাশক—শ্রীমৎ স্বামীবিশ্বানন্দগিরি। গীতাশ্রম, পোঃ পাড়াতল (বর্ধমান)।

প্রাপ্তিস্থান ঃ

মহেশ লাইব্রেরী ২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২

উপরিউক্ত পুস্তকের রচয়িতা শ্রীসতীরঞ্জন বেদান্ত দর্শনের এম. এ.। কিঞ্চিদধিক ৪০ বর্ষ বর্ধমান জেলার চকদীঘি সারদাপ্রসাদ অবৈতনিক উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকতার কার্য করেন। শ্রীগীতার বহু ভাষ্য, বহু টীকা বর্ত্তমান। প্রায় সব ভাষ্য টীকাই কোন না কোন সম্প্রদায়ের মতানুসারে এবং প্রাচীন যুগোপযোগী করিয়া লিখিত। গ্রন্থকার সমস্ত জীবনব্যাপী শ্রীগীতা ও অন্যান্য ধর্মশাস্ত্র আলোচনা এবং অনুধ্যান করিয়া এক সূত্র আবিষ্কার করেন, যাহা তাঁহার এই ব্যাখ্যায় প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অনুস্যূত এবং বর্ত্তমান যুগোপযোগীভাবে সম্প্রদায় নির্বিশেষের জন্য লিখিত। তিনি ছিলেন আধ্যাত্ম জগতের উচ্চস্তরের সাধক অথচ সাধারণ সমাজের সহিত চিরদিন যুক্ত। সেইজন্য তাঁহার এই অমূল্য ব্যাখ্যা ধর্ম সাধনার অতি সাধারণ স্তর হইতে উচ্চস্তর পর্যন্ত সকলকেই বিশেষভাবে সাহায্য করিতে পারে।

নিম্নে বিশিষ্ট অধ্যাপক ও বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার মতামতের কিঞ্চিৎ অংশ সাধারণের অবগতির জন্য দেওয়া হইল।

১। অধ্যাপক খগেন্দ্র নাথ মিত্র কর্তৃক বেতার অনুষ্ঠানে আলোচিত ঃ ·········এর থেকে আমরা গ্রন্থকারের বিশুদ্ধ অসাম্প্রদায়িক মানসের পরিচয়

পাই। আজকাল এই সাম্প্রদায়িক বিষে জর্জরিত মনুষ্য সমাজে এবম্বিধ কলহ দ্বন্দ্ব বর্জিত সার্বজনীনতা যে বিশেষ প্রশংসার যোগ্য তাতে সন্দেহ কি আছে ?

২। আনন্দ বাজার :—নাম করণের পৃষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া এই গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠা চিন্তাশীল দিগকে বিস্মিত ও পুলকিত করিবে। গীতার ন্যায় গ্রন্থের এমন সরল সুন্দর মনোভিরাম ব্যাখ্যান খুব বেশী হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না......জনসাধারণ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া একাধারে বিমল আনন্দ ও জ্ঞানলাভ করিবেন ইহাতে সন্দেহ নাই।

৩। হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড :— ...One must confess that he (Sri Sati Ranjan) has eminently succeeded in his task, for he gives here on exposition of the Gita which is at once natural, rational and universal.

৪। অমৃত বাজার পত্রিকা :—Sri Sati Ranjan Chattapadhyaya does his best to interpret the "Holly song" in a way which will appeal to men of all classes and stages of life. We are confident that the perusal of the volume will open new windows into your soul.

৫। দৈনিক বসুমতী :—পৃথিবীর সকল দেশেই গীতা সমাদৃত। ইহার ব্যাখ্যা কখনও সংকীর্ণ হইতে পারে না। দেশের ও কালের বিভিন্নতায় ইহার অর্থ বিভিন্ন হইবেই। সতীরঞ্জন বাবু সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

৬। যুগান্তর :—আলোচ্য গ্রন্থখানি পাঠে স্পষ্টই বুঝা যায় ব্যাখ্যাতা ক্লিষ্ট জিজ্ঞাসুর দুর্গতি বাড়াইবার জন্য নিষ্ঠুর শব্দে পাণ্ডিত্যের অস্ত্র ব্যবহার করেন নাই।